বাংলার নারী-জাগরণ

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

দৈনিক ভারত সম্পাদক

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

কলিকাতা

নিবেদন

উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে রাজা রামমোহন রায় যে সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি আন্দোলন আরম্ভ করেন তাহার দ্রুত প্রসার এক শতকেই বাঙ্গলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় আদর্শের আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়া বাঙ্গলার সংস্কৃতির এক নূতন রূপ দেওয়াতে বাঙ্গালী জীবনে এমন বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে যে বাঙ্গালী নূতনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই নবগঠনের কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস আজিও রচিত হয় নাই, অথচ ঐতিহাসিক মাল মসলা ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। এখনই এই ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ না করিলে ভবিষ্যতে তাহা করা সম্ভব হইবে না। পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করিবার ক্ষমতা ও যোগ্যতা আমার নাই, তবুও এই ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করিয়াছি এবং তাহার অভাব আমাকে ব্যথা দিয়াছে। সেজন্য আমার ক্ষুদ্র শক্তি ও সাধ্য অনুসারে আমার কর্ম্মজীবনের মধ্যে যে অবসরটুকু আমার আছে তাহার মধ্যে আমি এক একটি বিষয় লইয়া এই ইতিহাসের একটি খসড়া দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম। ইহার প্রথম ফল হইল আমার "ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া।" বর্ত্তমান পুস্তকটিও সেই নবসংস্কৃতির ধারার অপর আর একটি দিক। পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার দাবী আমার নাই; একটি খসড়ামাত্র রচনায় আমি চেষ্টা পাইয়াছি। জানিনা, তাহাতে কতটুকু সফল হইয়াছি।

উৎসর্গ

এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার যিনি সর্ব্বপ্রথম উন্মুক্ত করিয়া নারীর উচ্চ শিক্ষালাভের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন, চিকিৎসা বিদ্যায় সর্ব্ব-প্রথমে পারদর্শিনী হইয়া যিনি বহু রোগজর্জ্জর নারীর রোগযন্ত্রণার উপশম ঘটাইবার পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন, জাতীয় মহাসভায় সর্ব্বপ্রথমে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া নারীর রাষ্ট্রীক অধিকার স্বীকৃত করাইয়া লইয়াছেন ও নানাভাবে এদেশের নারী কল্যাণ যজ্ঞের যিনি অগ্রদূত, আমার পরমারাধ্যা জননী ৺কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে দীনসেবকের এই পুস্তকখানি নিবেদিত হইল।

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বাংলার নারী-জাগরণ

বাংলার নারী-জাগরণ

প্রথম অধ্যায়

রামমোহন যুগে নারী কল্যাণ আন্দোলন

মানুষের সমাজ জীবন যখন প্রথম বিকশিত হয়, তখন সেই বিকাশে নারীর দান অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের ন্যায় ও কয়েকটি ক্ষেত্রে পুরুষ অপেক্ষা অধিক হওয়াতে, প্রাচীনকালে সমাজে নারীর মর্য্যাদা বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু কালপ্রভাবে, সভ্যতার ধারা যখন অর্থনৈতিক পুঁজিদারবাদে গিয়া পৌঁছিল, তখন নারী অন্তঃপুরবাসিনী দাসীতে পরিণত হওয়াতে নারীর মর্য্যাদা কমিয়া যায়। তাহার পরে, ঊনবিংশ শতাব্দের গোড়ার দিকে, যখন মানুষের জন্মগত অধিকার সম্পর্কে চেতনার উন্মেষ মানুষের মনে দেখা দিল, তখন নারীজাতিরও যে মানুষের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইবার একটা দাবী আছে এবং সেই অধিকারে প্রতিষ্ঠিত না হইলে মানব সমাজের কল্যাণ সম্ভব নহে, এই বোধও ধীরে ধীরে জাগ্রত হইতে থাকে।

ইউরোপে এই জাগরণ, মিল, ওয়েন, কিংসলে প্রভৃতির চেষ্টায় অতি অল্পদিনেই নানাপ্রকার নারী কল্যাণ কর্ম্মে বেশ দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল; এই বাংলাদেশেও সেই যুগে এই ভাবধারা সেইরূপ ভাবে পরিস্ফুট হইয়া না উঠিলেও ঊনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভে স্বাধীনভাবে উহার সূচনা হইতে দেখা যায় এবং শতাব্দী শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহা এত শক্তিশালী হইয়া উঠে যে, পৃথিবীর যে কোনও দেশের নারী আন্দোলনের সহিত তাহার তুলনা চলে। এমন কি, কোন কোন বিষয়ে প্রগতিশীলতায় এদেশ ইউরোপকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল।

মানব-কল্যাণ যজ্ঞের ঋত্বিক রাজা রামমোহন রায়ের কোমলপ্রাণ নারীজাতির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিল। তাঁহার তিব্বত ভ্রমণকালে নারীজাতির সাহায্যে তাঁহার জীবন রক্ষা পায়। নারীর এই সাহসিক কার্য্যে রামমোহন মুগ্ধ হন এবং তাহার পর হইতে নারীজাতির দুঃখ দুর্দ্দশা বিমোচনে তিনি অত্যন্ত আগ্রহশীল হইয়া পড়েন। রামমোহনের অত্যন্ত অনুরাগী বান্ধবী মিস মেরী কার্পেণ্টার লিখিয়াছেন যে—

"তিব্বতবাসিনী রমণীগণের সস্নেহ ব্যবহারের জন্য তিনি নারীজাতির প্রতি চিরদিন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেন।"

তাহার পর রামমোহনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহনের মৃত্যু ঘটিলে, তাহার দ্বিতীয় পত্নী অলকমঞ্জরী দেবী সহমৃতা হইলে, সহমরণ প্রথার দোষ সম্পর্কে রামমোহনের যে অনুভূতি জাগে, তাহাতে তিনি এই প্রথা নিবারণ-কল্পে আন্দোলন সুরু করিয়া দেন।

খৃষ্টীয় মিশনারী আন্দোলন

রামমোহনের পূর্ব্বে খৃষ্টিয়ান মিশনারীগণ ও বিশেষভাবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার বুকানন সতী প্রথার নির্ম্মমতার বিরুদ্ধে আন্দোলন তুলিয়াছিলেন। ডাক্তার বুকাননের চেষ্টায় উক্ত কলেজের অধ্যাপক কোলব্রুক ও কেরীর তত্ত্বাবধানে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে কলেজের দশজন হিন্দু পণ্ডিত ছয় মাসের জন্য বিভিন্ন শ্মশানঘাটে দাহকারীদের শাস্ত্র প্রমাণ ও বিচার দ্বারা নিবৃত্ত করিতে থাকেন এবং এই সমস্ত শাস্ত্র প্রমাণ "শুদ্ধি সংগ্রহ" নামে একটি পুস্তকে প্রকাশ করেন।*

* Vide Buchanan's Christian Researches in Asia (pp. 39-41) and Memoirs of the Expediency of an Ecclesiastical Establishment (pp 114-15).

রেভারেণ্ড ক্লডিয়াস বুকানন প্রণীত "Memoirs of the Expediency of an Ecclesiastical Establishment" নামক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের ১১৪-১৫ পাতায় এ সম্পর্কে বলা হইয়াছে—

"The laws of the Hindoos, concerning the female sacrifice are collected in a book called Sodhee Sungrah ....on the comparison of these passages with the present practice of burning women in Hindoostan, little similarity will be found either in principle or ceremonial. In many particulars of the existing custom, the Hindu directly violate the laws of their religion. But all vows are optional. The committing of murder in consequence of a vow, does not lessen the guilt."

সতীদাহ সম্পর্কে সরকারী প্রয়াস

যে সমস্ত তথ্য ইঁহাদের চেষ্টায় প্রকাশিত হয় তাহাতে সতীদাহ প্রথার প্রতি ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লীর মনে এই "অস্বাভাবিক ও নৃশংস প্রথা সম্পূর্ণরূপে রহিত করা যাইতে পারে কি না" সে-সম্বন্ধে অনুসন্ধানের স্পৃহা জাগে।

সেইজন্য তাঁহারই আদেশে ভারত সরকারের বিচার বিভাগের সেক্রেটারী ডড্‌সওয়েল সাহেব, নিজামত আদালতের রেজিষ্ট্রার গুড সাহেবকে আদালতের পণ্ডিতগণের নিকট এই প্রথা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত কিনা তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের পাঁচই ফেব্রুয়ারী তারিখে এক পত্র লেখেন। নিজামত আদালতের পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্ম্মা এই অভিমত জ্ঞাপন করেন যে—

"যাঁহারা পত্যনুগমনের জন্য প্রস্তুত হন, তাঁহাদের অত্যন্ত শিশু সন্তান

থাকিলে, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা হইলে, ঋতুকাল হইলে, কিংবা নাবালক অবস্থা হইলে, তাঁহারা সহমৃতা হইবার যোগ্যা নহেন। উপরি উক্ত প্রতিবন্ধকগুলি না থাকিলে সহমৃতা হইতে কোনও নিষেধ নাই। কোনও উৎকট ঔষধ বা মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া কোন স্ত্রীলোককে সহমরণে উত্তেজিত করা অশাস্ত্রীয় ও লোকাচার বিরুদ্ধ। ঐরূপে অজ্ঞান বা উন্মত্ত করাও অবৈধ। সহমরণের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্কল্প করিতে হয় এবং অন্যান্য কতকগুলি বিধির অনুষ্ঠান করিতে হয়।"

এই অভিমত নিজামত আদালত ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের পাঁচই জুন তারিখে ভারত সরকারের গোচরে আনেন।*

তাহার পর ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ও ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে নিজামত আদালতের পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে তাঁহাদের মত ব্যক্ত করেন।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দের মতামতদানকারী পণ্ডিতদিগের মধ্যে পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার অন্যতম। তাঁহার এই মতামত দান ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া কেহ কেহ মৃত্যুঞ্জয়কেই সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনের স্রষ্টা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের বহু পূর্ব্বেই ঘনশ্যাম শর্ম্মা অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং এ ক্ষেত্রেও মৃত্যুঞ্জয় একক ছিলেন না; তাঁহার সহিত অপর দুইজন পণ্ডিতও অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আদালতের বেতনভুক্ কর্ম্মচারীর আদালতের আদেশে আইন সম্পর্কে এই অভিমত প্রদানকে তাঁহাদের জীবনের অভিপ্রায় বলা চলে না। তাঁহারা যদি সত্যসত্যই এই অভিমতকে সমাজে প্রচলিত দেখিতে চাহিতেন তবে এই অভিমত দিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত থাকিতেন না, সতীদাহের ন্যায় নৃশংস প্রথা যাহাতে বিলুপ্ত হয় তাহার জন্য রীতিমত আন্দোলন আরম্ভ

* Collection of printed papers relative to Hindoo Widows and Voluntary immolations (H. C.), pp. 26-28.

করিয়া দিতেন। রামমোহন ও তাহার বন্ধুবর্গ এই প্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তুলেন, মৃত্যুঞ্জয় তাহাতে যোগদান করেন নাই।

নিজামত আদালতের অভিমত পাওয়ার জন্য ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল তারিখে কতকগুলি অবস্থায় ভারত সরকার সতীদাহ নিবারণ করিতে সরকারী কর্ম্মচারীদের আদেশ প্রদান করেন এবং ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে নিজামত আদালত হইতে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে মাদক দ্রব্য সাহায্যে উন্মত্ত করিয়া কোন নারীকে সতী হইতে প্ররোচনা-দানের ফলে সতী হইবার উপক্রম হইলে তাহা নিবারণের আদেশ প্রদান করেন।*

রামমোহনের দান

রামমোহন রায় সেইজন্য সত্যসত্যই এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তক। তিনি ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য রীতিমত আন্দোলন সুরু করিয়া দেন। এই আন্দোলন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেও তিনি যে সতীদাহ নিবারণ কল্পে যত্নবান ছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি কালীঘাটে একটি সতীকে সতী হইবার সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন তাহা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের Asiatic Journal-এ উল্লিখিত আছে।

সরকারী আদেশ হিন্দুধর্ম্মকে আঘাত করে, এই কারণ দর্শাইয়া কয়েক-জন হিন্দুনায়ক ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের নিকট ঐ আদেশগুলি প্রত্যাহারের নিবেদন জানাইয়া দুইবারে দুইখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় আবেদন আগষ্ট মাসে প্রেরিত হয়। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের Asiatic Journal-এ উহা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

* Ibid—pp. 41

হিন্দুনায়কগণের এই আবেদনে ক্ষুব্ধ হইয়া রামমোহন সতী প্রথার অশাস্ত্রীয়তা প্রদর্শন করিয়া একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়া উহা আত্মীয় সভার সম্পাদক বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে প্রকাশ করেন ও সতীদাহ প্রথা সম্পূর্ণ নিবারিত করা ভারত সরকারের পক্ষে যদি সম্ভব না-ও হয় তাহা হইলে যে-সমস্ত বাধা এই প্রথার সম্পর্কে সরকার পক্ষ হইতে জারী করা হইয়াছে, তাহা রাখিয়া আরও নূতন নূতন বাধা সৃষ্টি করিতে আত্মীয় সভার উদ্যোগে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রতি-আবেদন প্রেরণ করিতে রামমোহন যত্নবান হন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ২৭শে মার্চ্চ হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর নামে রামমোহন একটি পত্র লিখিয়া এই আবেদনের পোষকতা করেন।

ইহার কিছুদিন পরে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের আলোচনাচ্ছলে সতীদাহ যে অত্যন্ত অশাস্ত্রীয় ও অমানুষিক আচার, তাহা প্রতিপাদন করিয়া বাংলা ও ইংরেজিতে পুস্তিকা প্রকাশ করেন, এই পুস্তকের প্রকাশক হইলেন আত্মীয় সভার সম্পাদক বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। (Vide Calcutta Journal 1819. April 10, pp. 119) এই পুস্তিকার ইংরেজি অনুবাদ সম্পূর্ণরূপে Government Gazette ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ২৪শে ডিসেম্বর ও Calcutta Journal ২৫শে ডিসেম্বর পুনর্মুদ্রিত করেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে রামমোহনের শিষ্য হরচন্দ্র রায় সম্পাদিত সর্ব্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্র "বাঙ্গালা গেজেটি"তে বাংলা পুস্তিকাটি পুনর্মুদ্রিত হয়। রামমোহনের এই পুস্তিকা যে আন্দোলন তুলে তাহাতে ভীত হইয়া রক্ষণশীল দল উহার উত্তর স্বরূপ ঘোষালবাগানের চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কবাগীশকে দিয়া "বিধায়ক নিষেধক সংবাদ" প্রকাশ করেন।*

* কাশীনাথ তর্কবাগীশ দুই পুস্তকের লেখক ; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রমবশতঃ উহা কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন প্রণীত লিখিয়াছেন।

তদুত্তরে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে রামমোহন সতীদাহ নিবারণকল্পে দ্বিতীয় পুস্তিকা প্রচার করেন ও Second conference between an opponent and a supporter of suttee নামে ইংরেজি অনুবাদ গভর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংসকে উৎসর্গ করিয়া ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৮২০) তারিখে প্রকাশ করেন। এই সমস্ত আন্দোলনের ফলে নিজামত আদালতের প্রধান বিচারপতি লিষ্টার (Leycester) সাহেব ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে এক মন্তব্যে বলেন যে, যে-সমস্ত অঞ্চলে সতীপ্রথা বিশেষ প্রচলিত ছিল না, সেই সমস্ত অঞ্চলে উহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হউক। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, এলাহাবাদ, বেরিলি, ফতেপুর, বুন্দেলখণ্ড ও কুল্লী অঞ্চলে এই আদেশ জারী হওয়া উচিত। দ্বিতীয় বিচারপতি কুর্টনি সাহেব অভিমত প্রকাশ করেন যে, সর্ব্বত্রই এই নৃশংস প্রথা রহিত করা সরকারের কর্ত্তব্য। অন্য দুইজন বিচারপতি এই আদেশ দানের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও উহা জারি হইলে প্রজার মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইবে এই অজুহাতে কোনও ব্যাপক আইনজারীতে উহারা অসম্মতি প্রকাশ করেন। তবে ইহাদের মধ্যে বিচারপতি ডোরিন বলেন যে, কেবলমাত্র একটি জেলায় উহা রহিত করিয়া ফলাফল দেখা যাইতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, হুগলি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে নিষেধ প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে। এই সকল অভিমত পাইয়া গভর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই অভিমত প্রকাশ করেন যে "এই তিনটি অভিমতের কোনওটিকে গ্রহণ করিবার উপযুক্ত সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই, শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আন্দোলনের ফলে ক্রমশঃ এই প্রথা উঠিয়া যাইবে।"

পরবর্ত্তী গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টের শাসনকালে নিজামত আদালতের বিচারপতিগণ সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে উত্তরোত্তর তীব্র মন্তব্য

করিয়া উক্ত প্রথার নিবারণ দাবী করিতে থাকেন, কিন্তু লর্ড আমহার্ষ্ট ও জনমতের পরিবর্ত্তনের জন্য অপেক্ষা করার পক্ষপাতী হওয়াতে উক্ত প্রথা নিবারিত হয় না। পরে স্যার উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে নিজামত আদালতের বিচারপতিগণ ও ভারতের সামরিক কর্ম্মচারিগণ সতীদাহ প্রথা নিবারণ চাওয়াতে বেণ্টিঙ্ক রামমোহনের সহিত উক্ত প্রথা সম্পর্কে আলোচনা করিতে চাহেন। রামমোহনের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া তিনি সতীদাহে সাহায্য করা অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং এই কার্য্যে সহায়তাকারীদের অবস্থাবিশেষে প্রাণদণ্ডও হইতে পারে ইহা ঘোষিত হয়। এইভাবে পরোক্ষভাবে সতীদাহ প্রথা তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

রক্ষণশীলদলের প্রতিবাদ

রক্ষণশীলদলের মুখপত্র সমাচার চন্দ্রিকা ও ধর্ম্মসভার পক্ষ হইতে এই বিধির তীব্র বিরোধ উঠে এবং বিধি তুলিয়া দিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াই কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টর্স ও পার্লামেণ্টে আবেদন-লিপি প্রেরণের ব্যবস্থা হয়; এইজন্য কলিকাতার ডেপুটি শেরিফ ও অ্যাটর্নী মিষ্টার ব্যাথিকে তাঁহারা নিযুক্ত করেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী কলিকাতার আটশত অধিবাসীর স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদন গভর্ণর জেনারেলের সমীপে ধর্ম্মসভা কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়।

নিবারণ-প্রয়াসীদের প্রচেষ্টা

সতীদাহ নিবারণকল্পে যাঁহারা চেষ্টিত ছিলেন, তাঁহারাও নীরব রহিলেন না। কলিকাতার খৃষ্টিয় অধিবাসীদের পক্ষ হইতে আটশত জন অধিবাসীর স্বাক্ষরযুক্ত একটি আবেদনে এবং রামমোহন রায় ও তাঁহার

অনুচরদিগের পক্ষ হইতে তিনশত ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদনে নূতন বিধিকে সমর্থন করা হয়।

ধর্ম্মসভা ইংলণ্ডে আপীল চালাইবার জন্য এগারো হাজার দুই শত ষাট টাকা চাঁদা তুলেন।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি রাজা রামমোহন রায় কলিকাতার টাউনহলে এক সভা করিয়া লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ককে সতীদাহ নিবারণ-বিধি প্রণয়ন করিয়া তিনি যে সৎসাহস দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য অভিনন্দন প্রদান করেন। এই অভিনন্দনে রামমোহন রায়, সম্বাদ কৌমুদীর হরিহর দত্ত, আত্মীয় সভার কালীনাথ রায়, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ তিনশত ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল। বাঙ্গালা অভিনন্দন পত্রটি কালীনাথ রায় ও ইংরেজি অনুবাদটি হরিহর দত্ত পাঠ করেন। *

রামমোহনের প্রবর্ত্তিত আন্দোলনে ভীত হইয়া ধর্ম্মসভা পক্ষীয়গণ তাঁহাকে "প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক" প্রকাশিত হওয়ার পর হইতেই "সতীদ্বেষী" বলিয়া অভিহিত করিতে থাকেন এবং তাঁহার ও তাঁহার অনুচরদিগের বিরুদ্ধে সামাজিক নির্য্যাতন আরম্ভ করিয়া দেন। নির্য্যাতনেও যখন তাঁহারা সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না, তখন রামমোহনকে হত্যা করিবারও ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয় এবং একাধিকবার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আক্রমণকারী দল কর্ত্তৃক তিনি আক্রান্ত হন। একবার এইরূপ আক্রমণের হস্ত হইতে তাঁহাকে তাঁহার সুহৃদ্ মণ্টোগোমারি মার্টিন রক্ষা করেন এবং এইরূপ আক্রমণ যাহাতে সম্ভব না হয় তজ্জন্য আগ্নেয়-অস্ত্রাদির সাহায্যে সজ্জিত হইয়া মিষ্টার মার্টিন কয়েকদিন রামমোহনের মানিকতলার বাটীতে অবস্থান করেন। মার্টিন ইহার একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

* Bengal Chronicle January 14, 1836.

আন্দোলনের প্রকৃত জনক

এই সমস্ত বিচার করিয়া সতীদাহ নিবারণ-আন্দোলনের প্রবর্ত্তক বলিয়া রামমোহনকে অভিহিত করা হয়। খৃষ্টান মিশনারীগণ বিদেশীয় বলিয়া তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত আন্দোলন দেশবাসীর চিত্তকে একেবারেই স্পর্শ করে নাই এবং দেশবাসীর কোনও অংশের সমর্থন ভিন্ন এইরূপ গুরুতর সামাজিক বিষয়ে সরকার পক্ষ হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই; কাজে কাজেই সে আন্দোলন তেমন কোনও ফল প্রসব করে নাই। নিজামত আদালতের পণ্ডিতগণের অভিমত কোর্টের হুকুমে ইংরেজ প্রভুদের সন্তোষ সাধনের জন্যই প্রদত্ত হইয়াছিল; সতীদাহ নিবারণকল্পে পণ্ডিতবর্গের কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। যদি তাঁহাদের সেইরূপ আগ্রহ থাকিত তবে তাঁহারা উহা নিবারণের জন্য কোনও না কোনও আন্দোলন সুরু করিয়া দিতেন। নিজামত আদালতে প্রদত্ত অভিমত ভিন্ন এই সম্পর্কে প্রকাশ্যে কোনও মতামত ব্যক্ত করিতে তাঁহাদের দেখা যায় না। এমন কি, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যে-সমস্ত পণ্ডিত কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক শ্মশান ঘাটে প্রেরিত হইয়া সতীগণকে নিরস্ত হইবার জন্য শাস্ত্রীয় মতামত দিয়া উদ্বোধিত করিতেন, তাঁহারা বেশ অবগত ছিলেন যে সতীদাহ প্রথা সমর্থনকারী বলিয়া তাঁহাদের পরিচয় কর্ত্তৃপক্ষ পাইলে তাঁহাদের চাকুরী থাকিবে না, কারণ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে গোলকনাথ শর্ম্মার মৃত্যু হইলে তদীয় পত্নী সহগামিনী হইতে ইচ্ছুক হওয়াতে তাঁহার ভ্রাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় চিতার অগ্নি প্রদান করেন বলিয়া তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য কার্য্য হইতে তাহাকে বরখাস্ত করা হয়। জোশুয়া মার্শম্যান তাঁহার জার্ণালে এই সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন যে "We, however thought it now our duty to bear a testimony against this infernal practice, by discharging the elder

brother who kindled the fire, from our service for ever, as a man whose hands were stained with blood"

পণ্ডিতবর্গ যে সতীদাহ নিবারণে আন্তরিক অভিপ্রায় হইতে এই কার্য্যে লিপ্ত না হইয়া চাকুরীর মায়াতে ভীতি-পরবশ হইয়াই কার্য্যে রত হইয়াছিলেন, তাহা মনে করিবার হেতু এই যে, পরে যখন আইন-সাহায্যে বিধি প্রণয়নের আন্দোলন আরম্ভ হয় তখন এই সমস্ত পণ্ডিতবর্গের কেহই সে আন্দোলনে যোগদান করেন নাই বা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সতীদাহ প্রথা আংশিক নিবারণ করার জন্য যখন রক্ষণশীল সমাজ হইতে প্রতিবাদ উঠে তখন প্রগতিবাদিগণের পক্ষ হইতে ঐ বিধি সমর্থন করিয়া যে আবেদন-লিপি প্রেরিত হয় তাহাতে ইহাদের কেহই স্বাক্ষর করেন নাই ও সমগ্র আন্দোলনে তাঁহারা নিশ্চেষ্টই ছিলেন।

অতএব, পরের হুকুমে শাস্ত্র-বিচার করাকে আন্দোলনের প্রবর্ত্তন বলা চলে না। ইংরেজ প্রভুর বিনা হুকুমে এবং তাঁহাদের মাহিয়ানা না খাইয়া স্বাধীনভাবে নিজের অন্তরের প্রেরণায় জাতির মধ্যে আন্দোলন উত্থাপন করার জন্য রামমোহন রায়ই এই আন্দোলনের যথার্থ প্রবর্ত্তক। রামমোহন ও তদীয় অকৃত্রিম সুহৃদ দ্বারকানাথ যে আন্দোলনের প্রবর্ত্তক তাহা সেই সময়কার বেঙ্গল ক্রনিকেল পত্রিকাতেই উক্ত হইয়াছিল। খৃষ্টিয় মিশনারীগণ এই আন্দোলনের জনক বলিয়া কেহ উক্তি করিলে পত্রিকায় লেখা হইয়াছিল যে "It having to our knowledge been chiefly promoted by two individuals amongst us of distinguished talents and public spirit, namely R. Roy and D. Tagore at whose expense the present eulogium is unmeritoriously conferred upon people who took no interest whatever in the matter in question.'

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর তারিখে বেঙ্গল হরকার পত্রেও মিসেস্ মার্টিন নামক একজন ইংরেজ মহিলা রামমোহনের এ সম্পর্কে কৃতিত্বের কথা সম্পূর্ণরূপে ঘোষণা করিয়াছেন।*

ইংলণ্ডে আন্দোলন

ব্যাথি ইংলণ্ডে পিটিশন দিলে পর রামমোহন তাহার বিরোধিতা করিয়া সতীদাহ নিবারণ বিধির সমর্থনে যে পিটিশন প্রদান করেন তাহা ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই পার্লামেণ্টের হাউস অফ্ লর্ড সভায় মার্কুইস অফ্ ল্যান্সডাউন দ্বারা উত্থাপিত হয়।

রামমোহন এই সময়ে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বেণ্টিঙ্ক যে-বিধি প্রণয়ন করেন তাহার সমর্থনে "A pamphlet containing some remarks in vindication of the resolution by the Government of Bengal in 1829 abolishing the practice of female sacrifice in India" নামে এক পুস্তিকা ইংলণ্ডে প্রচার করেন।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রিভি কাউন্সিলে বিধির সমর্থন ও প্রতিবাদের আপীলের শুনানী আরম্ভ হয়। বিধির বিরুদ্ধপক্ষে আপীল সমর্থন করেন ডাক্তার লুসিংটন, মিষ্টার ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ও মিষ্টার ম্যাকডুগ্যাল ও তাঁহাদের বিরুদ্ধপক্ষে মত ব্যক্ত করিতে উপস্থিত হন ইংলণ্ডের অ্যাটর্নী জেনারেল জে, স্কারলেট, স্যার সি, ওয়েদারেল, স্যার ই, সাজেন ও সার্জেণ্ট স্প্যাঙ্কি। রামমোহন শুনানীর সময় উপস্থিত ছিলেন।

*J. K. Majumdar Vol. III pp. 150.

সতীদাহ নিবারণে উল্লাস

প্রিভি কাউন্সিলের অনুমোদনে সম্রাট এই বিধি রোধ করার পক্ষে যে আপীল ধর্ম্মসভার পক্ষ হইতে করা হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য করেন। এই সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিবামাত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের দ্বৈভাষিক পত্রিকা রিফর্ম্মারের ইংরেজি সংস্করণের এক অতিরিক্ত সংখ্যা (Extraordinary Issue) ৫ই নভেম্বর প্রকাশিত করা হয় এবং এই আনন্দ-সংবাদ সাধারণে জ্ঞাপন করা হয়। বাঙ্গালার সংবাদ-পত্র জগতে ইহা একটি স্মরণীয় ব্যাপার, কারণ কোনও বিশেষ ব্যাপারের প্রচার-তৎপরতার প্রয়োজন অনুভব করিয়া extraordinary সংখ্যা প্রকাশ সম্পর্কে এখানকার সংবাদপত্র মহলে ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা। রিফর্ম্মার দুষ্প্রাপ্য, এমন কি ইহার সন্ধান পাওয়া কঠিন। তবে ১৪ই নভেম্বর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের সমাচার দর্পণের এক সংবাদে ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

দর্পণ লিখিতেছেন "গত ৫ই নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যার সময় রিফরমার এক্সট্রা অর্ডিনারি অর্থাৎ শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ইংরেজি ভাষায় যে সমাচার পত্র শ্রীভোলানাথ সেন দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া থাকেন সেই রিফরমার কাগজের একখানি অতিরেক পত্রীতে প্রকাশ করে যে বিলাতের সতীর মোকর্দ্দমা তিন দিবসের বিচার হইয়া শেষ ডিসমিস হইয়াছে অর্থাৎ আপীলকারীদের প্রার্থনা পূর্ণ হইল না।"

ব্রাহ্মসমাজের ন্যাস রক্ষক (ট্রাষ্টিগণ) বৈকুণ্ঠনাথ রায়, রমানাথ ঠাকুর ও রাধাপ্রসাদ রায় এই আপীল না গ্রহণ করার জন্য সপরিষদ সম্রাটকে ধন্যবাদ দিবার জন্য ১০ই নভেম্বর তারিখে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এক প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া ৬ই নভেম্বর পত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞাপন দিলেন। ১০ই নভেম্বরের সভায় ভারত-হিতৈষী, রামমোহনসুহৃদ মিষ্টার জেমস্ প্যাটল, ক্যাপ্টেন এভারেষ্ট ও ডেভিড হেয়ার উপস্থিত ছিলেন।

রাধাপ্রসাদ রায়ের প্রস্তাবে ও ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রামচন্দ্র গাঙ্গুলীর সমর্থনে দ্বারকানাথ ঠাকুর সভাপতি হন।

কালীনাথ চৌধুরী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, মথুরানাথ মল্লিক ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রাধাপ্রসাদ রায় উহার সমর্থন করেন। শ্যামলাল ঠাকুর দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে সম্রাটের অভিনন্দন পত্র প্রস্তুত করিবার কমিটি দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায়, মথুরানাথ মল্লিক, রাধাপ্রসাদ রায়, হরিহর দত্ত ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে লইয়া গঠন করিতে বলা হয়। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দেব প্রস্তাবের পোষকতা করেন। সভাপতি দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রস্তাব করেন যে, যেহেতু ইংরেজি ও বাঙ্গালা এই উভয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র লাহিড়ী ও শ্রীযুক্ত শ্যামলাল ঠাকুরের ন্যায় অতি অল্প ব্যক্তির আছে, সেইহেতু এই কমিটিতে ঐ দুইজনকে গ্রহণ করা হউক।

চন্দ্রশেখর দেবের প্রস্তাবে ও শ্যামলাল ঠাকুরের সমর্থনে রামমোহন রায়কে এই ব্যাপারে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাহার পর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে রেভারেণ্ড) ও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র রামমোহনের এই বিষয়ে যে নিষ্ঠা ও পরিশ্রম তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করেন।*

রামমোহন জীবিত থাকাকালে বাঙ্গালা দেশে প্রকাশ্য জনসভায় এইরূপে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার স্বীকৃতি হয়।

সতী পক্ষে ও দাহ নিবারণ প্রথার বিরুদ্ধে ধর্ম্ম সভার পক্ষে অর্থ গ্রহণ করিয়া যে সব ইংরেজ ব্যবহারজীব উপস্থিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে

* সমাচার দর্পণ ২৪শে নভেম্বর ১৮৩২।

ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন (Bethune) পরে এই নৃশংস প্রথা সমর্থনের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হন ও এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য ভারতে আইন সচিবরূপে আসিয়া স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। বিদ্যাসাগরের সাহচর্য্যে তিনি ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বিটন বিদ্যালয় স্থাপন করেন ও তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য দান করেন। সতীদাহ নিবারণ প্রচেষ্টার ইহাও পরোক্ষ ফল।

রামমোহন ও নারীশিক্ষা

সতীদাহ নিবারণ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিবার সময় নারীজাতির অধিকার সম্পর্কে রামমোহনের মনে অনেকগুলি সংস্কার চিন্তা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। তিনি "প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকে" নারীজাতির হীন দশার কারণ এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

"স্ত্রীলোকের শারীরিক পরাক্রম পুরুষ হইতে প্রায় ন্যূন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহাদিগকে আপনা হইতে দুর্ব্বল জানিয়া যে যে উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা স্বভাবতঃ যোগ্যা ছিল, তাহা হইতে উহারদিগকে পূর্ব্বাপর বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন ; পরে কহেন যে, স্বভাবতঃ তাহারা সেই পদ প্রাপ্তির যোগ্যা নহে।"

স্ত্রীলোকগণ বুদ্ধিতে পুরুষ অপেক্ষা হীন এবং সে জন্য তাহারা শিক্ষা লাভের যোগ্যা নহে বলিয়া যে বিচার পুরুষগণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে রামমোহন বলেন যে—

"স্ত্রীলোকদিগের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন যে তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে, ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হইতে পারে ; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা,

জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায়ই দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয়, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজপত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রপরায়ণা রূপে বিখ্যাতা আছেন। বিশেষতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে যে, অত্যন্ত দুরূহ-ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণপূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন।"

স্ত্রীশিক্ষায় মিশনারী-প্রচেষ্টা

রামমোহনের স্ত্রীশিক্ষার প্রতিপোষক এই প্রকাশ্য-উক্তির পূর্ব্বে যদিও খৃষ্টিয়ান মিশনারীগণ এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা পাইতেছিলেন, এদেশীয়গণের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা সমর্থনে বর্ত্তমান যুগে এদেশীয় কর্ত্তৃক ইহাই প্রথম প্রকাশ্য উক্তি। ইহার অনতিপরে রাজা রাধাকান্ত দেবের পোষকতায় স্কুল বুক সোসাইটির ও হেয়ার সাহেবের স্কুলের পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার মহাশয় "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া নারীজাতির বিদ্যাশিক্ষাদানের পোষকতা করেন। রাজা রাধাকান্ত দেব উক্ত পুস্তক মুদ্রণ ও প্রচার করিলেন এবং গৃহে শিক্ষা লাভ করিয়া কোনও রমণী পরীক্ষা দিতে চাহিলে স্কুল সোসাইটির বালকগণের পরীক্ষা গ্রহণ সময়ে নিজ বাটিতে রমণীগণের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া এদেশীয়গণের এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক হইলেন। কিন্তু প্রথমে তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্রী প্রেরণের বিরোধী ছিলেন, পরে বেথুন সাহেব স্কুল স্থাপন করিলে নিজ বাটিতে একটি স্কুল স্থাপন করেন।

হেয়ার সাহেবের প্রযত্নে স্কুল সোসাইটির স্কুলে বালিকাগণ পড়িতে পারিত; কিন্তু এ বিষয়ে কমিটির মধ্যে মতভেদ হওয়াতে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে

Female Juvenile Society নামে একটি নূতন সমিতি গঠন করিয়া সেই সমিতির হস্তে বালিকা বিদ্যালয়ের ভার দেওয়া হয়। পরে ইংলণ্ডে British and Foreign School Societyর উদ্যোগে মিস কুক নাম্নী একজন মহিলা এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য আগমন করেন; তিনি ১৮২১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এদেশে পৌঁছেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রযত্নে ২৪টি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়, কিন্তু কোনও বিদ্যালয়ে বেশী সংখ্যক বালিকা ছিল না। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে নেটিভ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন নামক একটি সভা স্থাপিত করিয়া সেই সভার হস্তে মিস কুক-প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলি পরিচালনের ভার দেওয়া হয়। এই সকল স্কুলে সাধারণতঃ বাগদী, মুচি, নমঃশূদ্র, জেলে প্রভৃতি সমাজের নিম্নস্তরস্থ শ্রেণীর নারীগণই পড়িতে আসিতেন।

মধ্যবিত্ত ভদ্র বালিকাদিগের জন্য বেসরকারী ভারতীয় পরিচালিত প্রথম স্কুল স্থাপিত হয় বারাসতে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে। প্যারীচরণ সরকার ও নবীনকৃষ্ণ মিত্র তাঁহার উদ্যোক্তা।

বঙ্গের বাহিরে বালিকা বিদ্যালয়

বোম্বাই সহরেও ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বালিকাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বোম্বাই প্রদেশের সকল হিতকর কার্য্যের মূল নৌরজি ফার্দনজি; তাঁহার ছাত্রগণ ষ্টুডেণ্টস লিটারারি অ্যাণ্ড সায়েণ্টেফিক সোসাইটি নামে জ্ঞানালোচনার জন্য একটি সভা স্থাপিত করেন এবং সেই সভার চেষ্টায় বোম্বাই শহরে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে পার্শী সম্প্রদায়ের জন্য তিনটি ও হিন্দুদিগের জন্য তিনটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু এই সমস্ত স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা অত্যন্ত অল্প ছিল; সব কয়টি স্কুল মিলাইয়া ত্রিশটি মাত্র

ছাত্রী পাওয়া গিয়াছিল।* নৌরজি ফার্দুনজির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাহার ছাত্রদের মধ্যে ভি, এন, মাণ্ডলিক, সোরাবজি বাঙ্গালি ও দাদাভাই নৌরজি বোম্বাই প্রদেশে নানা সমাজ ও দেশহিতকর কার্য্যে ব্রতী হন।

নারীর দায়াধিকারে রামমোহন

প্রচলিত প্রথানুসারে হিন্দু বিধবাগণ স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইতেন না। রামমোহন এই প্রথার বিরুদ্ধে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে "Brief Remarks Regarding Modern Encroachment on Ancient Rights of Female according to Hindu Law of Inheritance নামক পুস্তক রচনা করেন।

রামমোহন এই পুস্তকে প্রতিপাদন করেন যে ইউরোপীয় ব্যবহার শাস্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে দায়াধিকার সম্বন্ধে নারী-জাতির প্রতি ন্যায়বিচার অনেক অধিক করা হইয়াছে, কিন্তু পরবর্ত্তী টীকাকারগণের দোষাবহ মীমাংসার ফলে তাঁহারা সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া অত্যন্ত হীন অবস্থায় পতিত হইয়াছেন। তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও বিশুদ্ধ যুক্তি অবলম্বন করিয়া প্রমাণ করেন যে, টীকাকারগণের সিদ্ধান্ত অশাস্ত্রীয়। প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রানুসারে পত্নী মৃত পতির সম্পত্তিতে পুত্রদিগের ন্যায় সমানাধিকারিণী। একাধিক পত্নী থাকিলে তাহারা প্রত্যেকেই স্বামীর সম্পত্তির অংশভাগিনী। সপত্নী পুত্রেরা পুত্রহীনা বিমাতাকে যাহাতে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে না পারেন, প্রাচীন ঋষিগণ সেইজন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। দায়তত্ত্বের ও দায়ভাগের লেখকগণ ভুল করিয়া এই অভিমত প্রদান করিয়াছেন যে, স্বামী যদি

* ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান সোসাইটিতে দাদাভাই নৌরজির বোম্বাই সহরে নারীশিক্ষা সম্পর্কে এক বক্তৃতা হইতে।

জীবদ্দশায় পুত্রহীনা পত্নীকে সম্পত্তি ভাগ করিয়া না দিয়া যান, তাহা হইলে পুত্রহীনা বিধবা তাঁহার মৃত স্বামীর বিষয়ে কোন অংশেরই অধিকারিণী হইবেন না; পুত্রবতী নারীর বিষয়ে অধিকার নাই, পুত্রগণই বিত্তের অধিকারী, এই মতও ভ্রান্ত।

এই ব্যবস্থার ফলে, বিধবা নারীকে পুত্র ও পুত্রবধূদিগের অনুগ্রহের উপরই নির্ভর করিতে হয় এবং অনেক সময় অনাদর ও অবজ্ঞায় দিন যাপন করিতে হয়। বহুবিবাহের প্রাবল্যের জন্য বিধবা বিমাতার সংখ্যা বড় অল্প নহে; সপত্নীপুত্রদিগের নিকট অনেক সময়ই তাঁহাদের যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা হয়। দায়াধিকারের এই অন্যায় ব্যবস্থার ফলেই যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাংলা দেশেই সহমরণ ও বহু বিবাহের আধিক্য দেখা গিয়াছিল, ইহাও রামমোহন অনুভব করিয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবার দুঃখ দেখিয়া নারীজাতির মনে সেই দুঃখময় জীবন যাপনের সাধ স্বভাবতঃই কমিয়া যায় ও পরলোকে স্বর্গসুখভোগের আশাতেই তাঁহারা সহমৃতা হইবার অনুরাগী হয়েন। অধিক সংখ্যক স্ত্রী থাকিলেও বিত্তের ভাগ হইবে না, পুত্রগণের বিত্তের অংশ সমান থাকিবে এই জ্ঞান পুরুষদিগকে বহু বিবাহে প্ররোচিত করে; বিত্তভাগের ভয় থাকিলে বহুবিবাহ প্রথা কম হইয়া যাইত। এই সব কারণে শাস্ত্রযুক্তি অবলম্বন করিয়া তিনি বিধবা পত্নীর দায়াধিকার স্থাপনকল্পে আন্দোলন তুলিবার জন্য উক্ত পুস্তিকা রচনা করেন। দুঃখের বিষয় এই যে আজ পর্য্যন্তও রামমোহন রায়ের এই ন্যায়-সঙ্গত দাবী সম্পূর্ণ গৃহীত হয় নাই।

রামমোহন ও কন্যাপণ

কন্যাপণ লইয়া কন্যা বিবাহের কুপ্রথা তখন কয়েক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অর্থলোভে কন্যার পিতারা স্থলবিশেষে

রুগ্ন, বৃদ্ধ ও অঙ্গহীন ব্যক্তিগণের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিত। এই প্রথা সম্পর্কে রাজা লিখিয়াছিলেন যে—

"Such Brahmans and Kayasthas, I regret to say, frequently marry their female relations to men having natural defects or worn out by old age and disease, merely from pecuniary considerations, whereby they either bring widowhood upon them soon after marriage or render their lives miserable. They do not only degrade themselves by such cruel and unmanly conduct but violate entirely express authorities of Munoo and all other ancient lawgivers, a few of which I quote"—

রাজা কন্যাবিক্রয়ের বিরুদ্ধে শাস্ত্র হইতে এই স্থানে কতকগুলি বচন উদ্ধার করিয়া কন্যাবিক্রয়ের অশাস্ত্রীয়তা প্রদর্শন করেন।

বহু বিবাহ প্রথা নিরোধে রামমোহন

নারীজাতির কল্যাণ চিন্তা করিয়া রামমোহন রায় বহু বিবাহ প্রথার বিরোধিতা করেন। তিনি শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় ঋষিগণ দারান্তর গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন, অন্যথা নহে। তিনি দেখাইয়াছেন যে,—শাস্ত্র অনুসারে পত্নী যদি সুরাসক্তা, দুশ্চরিত্রা, স্বামীর প্রতি বিদ্বেষিণী, হিংস্র-স্বভাবা, অর্থনাশিনী, রোগগ্রস্তা হয়, তবে স্বামী দারান্তর গ্রহণ করিতে পারে। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে আট বৎসর, মৃতবৎসা হইলে দশ বৎসর পরে এবং যদি কেবল কন্যা সন্তান হইতে থাকে তাহা হইলে এগারো বৎসর পর্য্যন্ত দেখিয়া তবে পুরুষ বিবাহ করিতে পারে। সচ্চরিত্রা হিতকারিণী স্ত্রী রুগ্না হইলে তাহার সম্মতি ভিন্ন অন্য পত্নী গ্রহণ চলিবে না।

কোনও ব্যক্তি পত্নী বর্ত্তমানে দারান্তর গ্রহণ করিতে চাহিলে স্ত্রীর শাস্ত্র-বর্ণিত কোনও দোষ আছে তাহা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রমাণ করিতে পারিলে সেই ব্যক্তি পুনরায় বিবাহ করিবার অনুজ্ঞা পাইবে নতুবা পাইবে না, এইরূপ একটি নিয়ম গভর্ণমেণ্ট হইতে করিতে পারিলে ভাল হয়, এইরূপ অভিমত রামমোহন রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"Had a Magistrate or other public officer been authorised by the rulers of the Empire to receive applications for his sanction to a second marriage during the life of a first wife, and to grant his consent only on such accusation as the foregoing substantiated, the above might have been rendered effectual and the distress of female sex in Bengal and the number of suicides would have been necessarily very much reduced."

বর্ত্তমান যুগে নারীর নানা বিষয়ে সামাজিক অবস্থার বহুতর উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত রামমোহন-আকাঙ্ক্ষিত বহুবিবাহ প্রথা-নিরোধক আইন প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

বিধবাদের দুঃখে রামমোহন

রামমোহনের চিত্ত বিধবাদের দুঃখেও কাঁদিয়াছিল। তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহার মনে যে-পরিকল্পনা জাগিয়াছিল, তাহার ফলে সংবাদ কৌমুদীর ষষ্ঠ সংখ্যায় বিধবাদের ভরণপোষণের জন্য সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত ইউরোপীয়দিগের জন্য যে "সিবিল অ্যাণ্ড মিলিটারী উইডোজ ফাণ্ড" নামক ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার অনুরূপ একটি ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিতে এ দেশের ধনীদিগকে অহ্বান করেন। সংবাদ

কৌমুদী পাওয়া যায় না ; কিন্তু তাহাতে যে-সব বিষয় মুদ্রিত হইত তাহার যে-সংক্ষিপ্ত সূচী ক্যালক্যাটা জার্নালে দেওয়া আছে, তাহাতে দেখা যায় সংবাদ কৌমুদীর ষষ্ঠ সংখ্যার একটি লেখার বিষয় এই যে—

"An appeal to the wealthy Hindus of the Metropolis to take into their benevolent consideration the intolerable misery and distress in which a number of Hindoo widows are involved, in consequence of the destitute situation in which their deceased husbands have left them and to constitute a Society for their relief as well as for the benefit of future widows, under similar circumstances under the principle of the Civil and Military Widow Fund established by order of Government."

রামমোহন আইন পাশ করাইয়া বিধবাদের জ্বলন্ত চিতা হইতে যে কেবল উদ্ধার করিয়াছিলেন তাহাই নহে ; বৈধব্যদশায় তাঁহাদের যে আর্থিক দুর্গতি হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া তাহার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ একটি গঠনমূলক পরিকল্পনাও করিয়াছিলেন।

বিধবা বিবাহের সমর্থনও যে তিনি করিতেন তাহা আত্মীয় সভার একটি বিবরণ হইতে পাওয়া যায়। ১৮ই মে ১৮১৯ তারিখের এসিয়াটিক জার্নালে ইণ্ডিয়া গেজেট হইতে উদ্ধৃত একটি বিবরণে এই সভার একটি অধিবেশনের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে—"এই সভায় বালবিধবাদের বাধ্যতামূলক বৈধব্যের বিরুদ্ধে, বহুবিবাহের ও সহমরণের তীব্র নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।"

সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনে যাঁহারা তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন, তাঁহার মধ্যে পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ওরফে গুড়্গুড়ে ভট্টাচার্য্য একজন প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি তৎসম্পাদিত "সংবাদ ভাস্করে"

লিখিয়াছিলেন যে সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রচলন প্রভৃতি সমাজ-হিতকর ব্যাপারে রামমোহনকে সম্পূর্ণ সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি কলিকাতা শহরে রামমোহনের আশ্রয় লাভ করেন। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে রামমোহন বিধবা বিবাহেরও পক্ষপাতী ছিলেন এবং এই প্রথা প্রচলনে যত্ন লইবার তাঁহার বাসনা ছিল।

নারী-কল্যাণ-যজ্ঞের এই পুরোহিতটির বহুবিধ নারী-কল্যাণ-প্রচেষ্টার পরিচয় এত বেশী যে, বোধহয় পৃথিবীর কোনও নারী-হিতৈষীর এত বিবিধ প্রকার চিন্তা দেখা যায় না। সেইজন্য রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন যে—

"রামমোহন রায় স্ত্রীজাতির যেরূপ উকীল ছিলেন, এমন বোধ হয় সুবিখ্যাত মিল সাহেবও নহেন।"

নিজ পরিবারের মধ্যে যাহাতে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত না থাকিতে পারে সেইজন্য রামমোহন তাঁহার উইলে এই নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে যদি তাঁহার পুত্রগণ বা তাঁহাদের বংশধরের মধ্যে কেহ এক পত্নী বর্ত্তমান থাকিতে পুনরায় দারান্তর গ্রহণ করে, তবে সে তাঁহার বিত্তের ভাগ হইতে বঞ্চিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রামমোহনোত্তর ও প্রাক্‌বিদ্যাসাগরীয় যুগে নারীকল্যাণ

রামমোহন যে কল্যাণ যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া গেলেন তাহা তাঁহার তিরোভাবের পর তেমন শক্তিশালী না থাকিলেও একেবারে নিভিয়া যায় নাই। ডিরোজিওর শিষ্যবর্গ তখন বাংলার চিন্তাজগতের নায়কের আসন আপনাদের সংঘ-শক্তির বলে দখল করিয়া লইয়াছিলেন। এই দলের তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহনের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার সতীদাহ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। সতীদাহ প্রথা নিবারিত হইলে ইংলণ্ডে সতীপক্ষীয়গণের আপীল যখন খারিজ হইয়া গেল, তখন ইংলণ্ডেশ্বরকে তজ্জন্য ধন্যবাদ দিবার ও রামমোহনের এই বিষয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করিবার জন্য যে সভা হয় তাহাতে কৃষ্ণমোহন বক্তৃতা করেন ও রামমোহনের মৃত্যুর পর যে প্রথম স্মারকসভা হয় তাহাতে রসিককৃষ্ণ রামমোহনের নারীকল্যাণ যজ্ঞের বিষয় উল্লেখ করেন। ইঁহারা তিনজন ব্যতীত রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি ইঁহাদের বন্ধুবর্গ রামমোহনের তিরোভাবের পর রামমোহনের শিষ্য পাদ্রি অ্যাডাম ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রভাবে আসিয়া পড়েন। অ্যাডাম সাহেব ইংলণ্ডে যে British Indian Society করেন, তাহার সহিত ইঁহাদের যোগ ছিল এবং ঐ সভার সদস্য জর্জ্জ টমসনকে দ্বারকানাথ ঠাকুর এ দেশে লইয়া আসার পর যে Bengal British

India Society টমসনের প্রযত্নে স্থাপিত হয়, ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সদস্য দলভুক্ত ছিলেন।

বিধবাবিবাহ সমর্থনে প্রথম পাঁতি

এই বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি বিধবাবিবাহ সমর্থনে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার অন্বেষণে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট উপস্থিত হইলে, রামচন্দ্র বিধবাবিবাহের পোষকতা করিয়া শাস্ত্রীয় ভিত্তিতে একটি অত্যন্ত উদার ব্যবস্থাপত্র রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর বেঙ্গল হরকরা পত্রে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসের ১১ই তারিখে এই সম্পর্কে বলা হয় যে—

"The liberal Vivasthu which he recently gave regarding the remarriage of Hindu widow, on the application of the Bengal British India Society, should rank him at the head of Hindu reformers."

রামগোপাল, তারাচাঁদ, প্যারীচাঁদ প্রভৃতি বন্ধুগণ এই সময়ে এ দেশের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক আন্দোলন চালাইবার জন্য রামগোপালের সম্পাদকতায় "বেঙ্গল স্পেক্টেটর" নামে একটি পত্রিকা বাহির করিবার সঙ্কল্প করেন। রামগোপাল তাঁহার বন্ধু গৌরদাস বসাককে এ বিষয়ে যে পত্র লেখেন তাহাতে উক্ত পত্রিকা প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্য যে বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা প্রদর্শন, তাহা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন।*

প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি মিলিয়া সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ্ সমিতি বলিয়া একটি সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতির সভ্যগণ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর কাশীপুরে কিশোরী-

* Sannyal's Life of Ram Gopal Ghose-এর পরিশিষ্টে এই পত্রটি আছে।

চাঁদের গৃহে এক সভায় কিশোরীচাঁদের প্রস্তাবে স্থির করেন যে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তন, হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ, বাল্যবিবাহ বর্জ্জন ও বহুবিবাহ রোধের জন্য সমিতির শক্তি বিশেষভাবে নিয়োগ করা হউক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভার সভাপতি ও কিশোরীচাঁদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও রাধানাথ শিকদার প্রভৃতি এই সভার সদস্য ছিলেন।*

এই সভার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে তাঁহাকে পুরষ্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে রামগোপাল ঘোষণা করেন। এই বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনার জন্য মধুসূদন দত্ত প্রথম পুরষ্কার ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন।

দানবীর মতিলাল শীল মহাশয় এই সময়ে ঘোষণা করেন যে কোনও হিন্দু ভদ্রলোক যদি উৎসাহী হইয়া কোনও হিন্দু বিধবার পাণি গ্রহণ করেন তবে তিনি সেই ভদ্র ব্যক্তিকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন।

ইহার পূর্ব্বে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই মতিলাল শীল ভ্রূণহত্যা নিবারণ কল্পে অন্তঃসত্ত্বা বিধবাদিগের জন্য প্রসূতিথানাব ও নবজাত শিশুদের জন্য আবাস নির্ম্মানকল্পে ডাক্তার ও'সাগুণসির মারফত সরকার-হস্তে একলক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এই সংবাদটি ১২ই ফেব্রুয়ারীর হরকরা পত্র হইতে ১৮৪০ খ্রীঃ মে মাসের এসিয়াটিক জার্নালে উদ্ধৃত হয়।

*শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ রচিত "কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ" পৃঃ ৯৯

সংবাদটি এই—"Baboo Muttylal Seal has communicated through Dr. O'shaughenessy, to the government, his intention for expending a lac of rupees on the immediate establishment of an assylum for pregnant Hindu widows together with a foundling hospital and school." Vide Journal, Asiatic May, 1840—Asiatic Intelligence pp. 19.

প্রথম বিধবা বিবাহ সহায়ক সভা

বৌবাজার অঞ্চলে কয়েকটি যুবকের চেষ্টায় কয়েকজন উদার মতাবলম্বী পণ্ডিত এই সময়ে বিধবা বিবাহের সমর্থক হন এবং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা উক্ত কার্য্যে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্য লইয়া একটি সমিতি গঠন করেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বরের "হরকরা" পত্রে আছে যে—

"—A Society for the remarriage of Hindoo widow—We understand that some respectable youngmen at Bowbazar having associated themselves with some clever and liberal-minded Pandits of the country, have established a club for the purpose of consulting the ways and means for the marriage of Hindoo widow.

তত্ত্ববোধিনী সভার দান

বাংলাদেশে ডিরোজিওর শিষ্যবর্গ, অ্যাডাম ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সংস্পর্শে আসিয়া সমাজ সংস্কার কার্য্যে ও নারী কল্যাণ ব্রতে এইভাবে যখন উৎসাহের সহিত কর্ম্মে রত হইয়াছিলেন, তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মনেও কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দিবার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। বিষয়-বাসনা হইতে

আপনার চিত্তকে সংযত করিয়া এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন-প্রচারিত ধর্ম্মে আপন চিত্তকে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রভাবে ধীরে ধীরে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছিলেন ও "তস্মিন প্রীতি ও তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য ও ধর্ম্মের সেবায় যাহাতে ভাল ভাবে আত্মসমর্পণ সম্ভব হয় তাহার জন্য সঙ্ঘ গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সেইজন্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের তত্ত্বাবধানে দেবেন্দ্রনাথ যে তত্ত্ববোধিনী সভা নামক সঙ্ঘ গঠন করিলেন তাহাতে ডিরোজিওর শিষ্যদলের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রাধানাথ শিকদার, চন্দ্রশেখর দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি এই সভায় যোগ দিলেন।

গোড়া হইতেই সেইজন্য এই সভায় একটা বিপ্লবী মনোভাব দেখা দেয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিশাল অন্তর এই বিপ্লববাদীদের ডাকে সাড়া দেয় এবং তিনিও তত্ত্ববোধিনীর ছায়াতলে আসিয়া দণ্ডায়মান হন। এই মনিকাঞ্চন যোগের ফলেই বিধবা বিবাহ সমর্থন ব্যাপারটি রীতিমত আন্দোলনে পরিবর্ত্তিত হইল ও বিদ্যাসাগরের বিশালচিত্ত ও বিরাট মননশক্তি এই আন্দোলনকে এত শক্তিশালী করিয়া তুলিল যে পূর্ব্ব হইতে জমি প্রস্তুত হইয়া থাকিলেও তাঁহাকেই বিধবা বিবাহের জনক বলা যায়।

প্যারীচাঁদ, কিশোরীচাঁদ, রামগোপাল, রামতনু ও অক্ষয়কুমার প্রভৃতি বন্ধুগণ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াছেন। রামতনু আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধারাণী ও অন্নদায়িণীকে এমন ভাবে গড়িয়া তুলিয়া ছিলেন যে তাহারা পরে নারী-সমিতি স্থাপন করিয়া বহু সৎকার্য্যে নারী-শক্তিকে প্রকটিত করিতে সহায়তা করিয়াছেন।

অক্ষয়কুমার আবার নানাপ্রকার নারীকল্যাণ আন্দোলন স্বজনের জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখনী চালনা করিতে থাকেন। সরল বাংলা গদ্যে নানা প্রকার জ্ঞানপ্রদায়ী ও চিন্তা উদ্রেককারী প্রবন্ধ-সম্ভারে তত্ত্ববোধিনী সমৃদ্ধ থাকিয়া বাংলার সংবাদপত্র মহলে যুগান্তর আনিয়াছিল; এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসকল সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত বলিয়া অক্ষয়কুমারের সমাজ-সংস্কার বিষয়ে প্রবন্ধগুলি এদেশে তুমুল আন্দোলন তুলে।

জর্জ্জকুম্বের "Constitution of Man" পুস্তকের ভাব অবলম্বন করিয়া অক্ষয়কুমার "মানবের সহিত বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধ বিচার" করিয়া যে সমস্ত প্রবন্ধ লেখেন এবং যাহা ১৮৫২ জানুয়ারী মাসে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তাহা এদেশে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করে। ইহাতে ভিন্নজাতীয় কন্যা বিবাহের যৌক্তিকতা, অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের বিবাহের অকর্ত্তব্যতা, বহু বিবাহের কুফল, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে যে সমস্ত অখণ্ডনীয় যুক্তি দেওয়া আছে তাহা পাঠে সুদূর মফঃস্বলেও ছাত্রমহলে গভীর আন্দোলন উঠে। ঢাকা জেলার কালীপাড়া গ্রামের স্কুলের ছাত্রগণ প্রতিজ্ঞা করেন যে—"এই পুস্তকে লিখিত বিবাহাদির নিয়ম প্রতিপালন করিব।" অন্যান্য স্থানের উল্লেখ না করিলেও এই একটি গ্রামের বিষয় উল্লেখ এই জন্য প্রয়োজন যে, তখন এই স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে উত্তর কালে "অবলা বান্ধব" নামে প্রসিদ্ধ, নারীকল্যাণব্রতী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই স্কুলের অন্যতম ছাত্র ছিলেন এবং অক্ষয়কুমারের পুস্তক পাঠেই নারীকল্যাণাকাঙ্ক্ষার অঙ্কুর তাঁহার মনে উপ্ত হয়। দ্বারকানাথ তাঁহার "নববার্ষিকী"তে অক্ষয়চন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে—

"ইনিই প্রকাশ্যরূপে বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের অবৈধতা, বিধবাবিবাহ

ও অসবর্ণ বিবাহের আবশ্যকতা দেশীয়লোকদিগকে প্রদর্শন করিয়াছেন।... বঙ্গীয় যুবকমণ্ডলীর ভাব ও চিন্তার গতি ইনি যে পরিমাণে পরিচালিত করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত আর কোন ব্যক্তি সেইরূপ পারিয়াছেন কিনা সন্দেহস্থল।”

দ্বারকানাথ যে অক্ষয়কুমারের লেখনী হইতেই প্রথম প্রেরণা লাভ করেন তাহা অক্ষয়কুমারের জীবনী লেখক মহেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় দ্বারকানাথের নিকট হইতে শুনিয়া অক্ষয়চন্দ্রের জীবনীতে অক্ষয়চন্দ্রেব যুবজনের উপর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কালে লিখিয়াছেন।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া বুঝা যায় যে তত্ত্ববোধিনীর সংস্কারমূলক কার্য্য সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

বিদ্যাসাগরীয় যুগ

তত্ত্ববোধিনীর দল যে কেবলমাত্র বিধবা বিবাহ আন্দোলন লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন তাহা নহে। তাঁহারা জীবনের প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই নূতন জীবনের স্পন্দন আনিয়াছিলেন। এক এক জন দিক্‌পাল জীবনের এক একটি দিকে নূতন নূতন শক্তির সঞ্চার করিতে ও বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তন আনিতে লাগিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশেষভাবে বিধবা বিবাহ আন্দোলন নিজের জীবনের সাধনারূপে বরণ করিয়া লইলেন। বিধবা বিবাহের সমর্থনে তাঁহার প্রথম প্রকাশ্য ঘোষণা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মারফতেই ঘোষিত হয়। ১৭৭৬ শকের ফাল্গুন মাসের (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়—বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা—এই শিরোনামায় বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ও পরের বৎসর (১৭৭৭ শক) (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর) অগ্রহায়ণ মাসে উক্ত পত্রিকাতে "বিধবা বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের উপক্রমভাগ" প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার চৈত্রমাসে (১৭৭৬ শকে) বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করিয়া পত্র লেখেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রকাশ্যে পত্রিকার মারফৎ বিধবা বিবাহ সমর্থন করিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাজ সংস্কার সম্পর্কে অবহিত হইয়া সংস্কারক দলের সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন।

সর্ব্বশুভকরী সভা

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ঠনঠনীয়ায় রামচন্দ্র চন্দ্রের বাড়ীতে কয়েকজন সমাজ-সংস্কারাভিলাষী "সর্ব্বশুভকরী সভা" নামে একটি সভা সংস্থাপন করেন। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল "যাহাতে দেশপ্রচলিত যে সমস্ত কুরীতি ও কদাচারের জন্য এ দেশের বিষম অনিষ্ট ঘটিতেছে, এই সমস্ত কুরীতি ও কদাচার চিরদিনের নিমিত্ত হতাদর ও দূরীভূত হয় সাধ্যানুসারে তদ্বিষয়ে যত্ন করা" এবং বিশেষভাবে "কৌলিন্য ব্যবস্থা, বিধবা বিবাহ প্রতিষেধ, অল্প বয়সে বিবাহ প্রভৃতি যে কতিপয় অতি বিষম অশেষ দোষকারক কুৎসিত নিয়ম প্রচলিত আছে তৎসমুদয় নিরাকরণ করা। *

এই সভার উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য সভা হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস "সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা" নামে একখানি পত্রিকাও প্রকাশ করা আরম্ভ হয়। পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে শ্রীমতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম থাকিত; কিন্তু পত্রিকার প্রধান লেখক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার। প্রথম সংখ্যায় "বাল্যবিবাহ দোষ" নামক প্রবন্ধটি ঈশ্বরচন্দ্রের লিখিত ও দ্বিতীয় সংখ্যায় "স্ত্রীশিক্ষা" বিষয়ক প্রবন্ধটি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের রচিত। প্রবন্ধগুলি স্বাক্ষরিত না হইলেও উহা যে তাঁহাদের রচনা তাহা বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁহার "বিদ্যাসাগরেব জীবনচরিতে" লিখিয়াছেন ও রাজনারায়ণ বসু তাহার "আত্মচরিত"-এও বলিয়াছেন।

এই পত্রিকায় মদ্যপান ও মাংসাহারের বিরুদ্ধাচরণ করা হইত। সর্ব্ব শুভকরী সভার "বীজ স্বরূপ" ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের খুল্লতাত তারক-

* সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে উক্ত পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রদত্ত বিবৃতি হইতে।

চন্দ্র দত্ত। ইনি তত্ত্ববোধিনী সভা, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ ও পরে ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইলে তাহার উৎসাহী সদস্য ছিলেন। এই সর্ব্ব শুভকরী সভার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, "বিধবা বিবাহ প্রতিষেধ" বিধি যে সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর, তাহা স্বীকার করিয়া তাহার প্রতিকূলতা করিতে ও বিধবা বিবাহ প্রচলন করিতে উদ্যোগ করা। কাজে কাজেই বলা যায় যে, এই সভার সম্পর্কেই ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবা বিবাহ প্রচলনের প্রথম প্রয়াস দেখা যায়।

বিদ্যাসাগরের জীবনের শ্রেষ্ঠতম ব্রত

বিধবা বিবাহ প্রচলন যে বিদ্যাসাগরের জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য ছিল, তাহা তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র নারায়ণচন্দ্রের যখন বিধবা বিবাহ হয় (১১ই আগষ্ট, ১৮৭০) তখন ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রকে বিদ্যা-সাগর মহাশয় যে পত্র লেখেন, তাহাতে বলিয়াছেন যে—

"বিধবা বিবাহের প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম, জন্মে ইহার অপেক্ষা অধিক আর কোন সৎকর্ম্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই ; এ বিষয়ে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নই। ...... আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক তাহা করিব ; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।"

এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া তিনি মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিতে থাকেন :

"সুতরাং অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে গুরুতর ঋণজালে আবদ্ধ হইলেন। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ পরামর্শদাতাগণের মধ্যে ছিলেন না, কিন্তু তথাপি তিনি স্বাভাবিক ঔদার্য্য বশতঃ অর্থদ্বারা ইঁহাকে

বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সাহায্য প্রাপ্তি সত্ত্বেও ইঁহার প্রায় পঞ্চাশ সহস্র টাকা ঋণ হয়। বিদ্যাসাগর ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন শুনিয়া অনেকে ইঁহার সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কি অভিপ্রায়ে চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে, ইনি তাহার অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, অনেকেরই বিধবা বিবাহে কোনও প্রকার সহানুভূতি নাই, কেবল ইঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। ইনি এইরূপ দান গ্রহণে সম্মত হইলেন না। সুতরাং সংবাদপত্রে সর্ব্ব সাধারণকে এইরূপ লিখিয়া জানাইলেন, "যাঁহারা বিধবা বিবাহের সাহায্যার্থ এক পয়সা পর্য্যন্ত দান করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের প্রদত্ত অর্থ সাদরে গৃহীত হইবে। কিন্তু যাঁহারা আমাকে বিপন্ন ভাবিয়া আমার সাহায্যের নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বিরত হইবেন, আমি নিজ দায় ভার অন্যের সাহায্যে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি না।"*

বিদ্যাসাগর মহাশয় পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ঐগুলি পুস্তকাকারে বাংলায় ও ইংরেজি অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন ও ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকের স্বাক্ষরিত একটি আবেদনলিপি ভারত সরকারের নিকট প্রেরণ করিয়া বিধবা বিবাহ আইনসঙ্গত করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

এই আবেদন তত্ত্ববোধিনী সংবাদ ভাস্কর ও মাসিক পত্রিকা সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ লেখেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত আন্দোলনের ফলেই ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুলাই বিধবা বিবাহকেও আইনসঙ্গত সিদ্ধ বিবাহ স্বীকারমূলক আইন, ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হয় এবং

* নববার্ষিকী, পৃষ্ঠা ১৯৯—২০০।

বিলের পাণ্ডুলিপি পেশ করিয়া জন পিটার গ্রাণ্ট বলেন যে, বিলের সমর্থনে পাঁচ হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত পঁচিশটি আবেদন ও বিপক্ষে পঞ্চাশ হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত চাল্লশটি আবেদন পাওয়া গেলেও সরকার পক্ষ এই বিলের মূল বিষয়টি সমর্থন যোগ্য বিবেচনা করেন, সেইজন্য এই বিল পেশ করা হইল। বিভাগীয় শাসন কর্তাদের মধ্যে আগ্রা প্রদেশের লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর এই বিলে পূর্ণ সমর্থন জানাইয়া ছিলেন; বাংলা বোম্বাই প্রভৃতির শাসকবর্গ নীরব ছিলেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই তারিখে উক্ত সনের ১৫ সংখ্যক আইনের বলে বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হয়। ২৬শে জুলাই তারিখে গভর্ণর জেনারেলের অনুমতি লাভ করাতে আইনে পরিণত হয়। ভারত সরকারের সেক্রেটারী সিসিল বিডন সাহেব ব্যবস্থাপক সভাকে জ্ঞাপন করেন যে—

"The Governor General informs the legislative Council that he has given assent to the bill which was passed by them on the 19th of July 1856 entitled bill to remove all legal obstacles to the marriage of widows"

সামাজিক নির্য্যাতন, বন্ধুবর্গের সহিত বিচ্ছেদ, ঋণজাল প্রভৃতি সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর আজীবন সঙ্কল্পে অটুট ছিলেন।

প্রথম বিধবা বিবাহ

আইন পাশ হইবার পাঁচ মাসের মধ্যেই আইন সিদ্ধ প্রথম বিধবা বিবাহ হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগরের প্রিয়পাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বালবিধবা কালীমতী দেবীকে আইন সঙ্গতভাবে বিবাহ করেন।

ইহার বহু পূর্ব্বে অবশ্য রাজা দক্ষিণারঞ্জন বর্দ্ধমানের বিধবা

রাণী বসন্তকুমারীকে বিবাহ করিয়া একাধারে বিধবা ও অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে-বিবাহ যে কেবল দেশাচার বিরুদ্ধ ছিল তাহাই নহে, আইনত সিদ্ধ ছিল কিনা সন্দেহ। তখন বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ আইন পাশ হয় নাই; কিন্তু দক্ষিণারঞ্জন নিজ বিবাহ সিদ্ধ করিবার মানসে কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে এক দলিল সম্পাদন করিয়া বসন্তকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহের সাক্ষী হন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ বা গুড়্গুড়ে ভট্টাচার্য্য ও ডাক্তার দ্বারিক গুপ্ত। মতিলাল শীল বিবাহের পোষকতা করেন। পর জীবনে দক্ষিণারঞ্জন বসন্তকুমারীর গর্ভজাত নিজপুত্র মনোরঞ্জনের যুক্তপ্রদেশের এক সুকুল ব্রাহ্মনের কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহরূপ সংস্কার সাধন করেন।

দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনীর দল বিদ্যাসাগরের এই কার্য্যে সহায় হইলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজ পরিবারেও বিধবা বিবাহ প্রচলন করিলেন। বিধবা বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইবার পর, তৃতীয় ও চতুর্থ বিবাহ হয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের উদ্যোগে তাহার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র দুর্গানারায়ণ বসু ও ভ্রাতা মদনমোহন বসুর। এই ব্যাপারে যখন রাজনারায়ণ আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হন, তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণকে পত্র লিখিয়া সমর্থন করেন। অক্ষয়কুমার দত্ত-ও রাজনারায়ণকে লেখেন যে—

"আপনি মেদিনীপুর অঞ্চলে বিধবা বিবাহ সম্পাদনার্থে সচেষ্টিত আছেন শুনিয়া সুখী হইয়াছি। আমাকে তদ্বিষয়ের সমাচার লিখিতে আলস্য করিবেন না। বিদ্যাসাগরকে মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেও ক্রটি করিবেন না। জয়োস্তু! জয়োস্তু!" *

* প্রবাসী—১৩১১ ফাল্গুন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে "সমাজ-উন্নতি-বিধায়িনী সুহৃদ সমিতির" সভাপতি ছিলেন, সেই সমিতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিধবাবিবাহ সমর্থন। তাহা হইতেও বুঝা যায় যে দেবেন্দ্রনাথও এই সংস্কারের পোষক ছিলেন।

বহুদারান্তর নিরোধ-প্রচেষ্টা

বিদ্যাসাগর বহুদারান্তর নিরোধ করিবার জন্য ঐরূপ বিবাহ আইন বিরুদ্ধ করিতে সরকারকে একবার ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ২৭শে ডিসেম্বর ও পুনর্ব্বার ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে অনুরোধ করিয়া বিফল হন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ২৭শে ডিসেম্বর বর্দ্ধমান-রাজ মহাতাপচাঁদ এইরূপ আইন পাশ করিতে সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের আকাঙ্খিত এই শুভ সামাজিক বিধান আজও আইন-গ্রাহ্য হয় নাই।

সরকারের সাহায্যে বঞ্চিত হইয়া জনমত গঠনের জন্য তিনি পুস্তক রচনা করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এই বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে প্রথম পুস্তক ও ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় পুস্তক রচনা করেন। আইনের সাহায্যে বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ না হইলেও জনমতের চাপে যে বহু-বিবাহ বিরল হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রচেষ্টার ফলেই উহা সম্ভব হইয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর এইদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্যও যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। বিটন সাহেব (প্রচলিত নাম বেথুন) যখন স্ত্রীশিক্ষা প্রচার কল্পে বিটন স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন; তখন বিদ্যাসাগর তাঁহার সহায়

হন এবং ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে উক্ত স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদকরূপে কাজ করেন। বিদ্যাসাগরের উৎসাহে তাঁহার বন্ধু মদন-মোহন তর্কালঙ্কার তদীয় কন্যাকে এই স্কুলের প্রথম ছাত্রীরূপে ভর্তি করেন।

এই স্কুল স্থাপনে বেথুন সাহেবকে তত্ত্ববোধিনী দলস্থ আরও তিনজন মহাপ্রাণ বিশেষভাবে সাহায্য করেন—রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ ও পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার। ১৮৫০খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ্চ তারিখে বেথুন গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসিকে বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কে যে পত্র লেখেন তাহাতে বলেন—

"The three natives to whom I desire specially to record my gratitude for their assistance are Baboo Ram Gopal Ghose, the well-known merchant who was my principal adviser in the first instance and who procured me my first pupils, Baboo Dakskina Ranjan Mookerjee, a zemindar, who was previously unknown to me, but who as soon as my design was published, introduced himself to me for the purpose of offering me the free gift of a site for the school or five bighas of land valued at 10,000 Rupees in the native quarter of the town and Pandit Madan Mohon Turkalankar, one of the pandits of the Sanskrit College, who not only sent his two daughters to the school but has continued to attend it daily to give gratituous instruction to the children in Bengali and has compiled Bengali Books expressly for their use.*

আপন কন্যাদ্বয়কে বেথুন-স্কুলে প্রেরণের জন্য স্বগ্রাম (বিল্বগ্রাম)

* Richey—"Selection from Educational Records" pt II 1840-57 pp 52-53

বাসিগণ তাঁহাকে সমাজচ্যুত করেন। বাঁশবেড়ীয়ার হরদেব চট্টোপাধ্যায় এই সময়ে আপন কন্যাকে স্কুলে প্রেরণ করেন। উত্তর কালে হরদেব বাবুর দুই কন্যার সহিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দুই পুত্রের বিবাহ হয়।

মহর্ষিদেব নিজকন্যা সৌদামিনীকেও বেথুনবিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। ১৮৫১ জুলাই মাসে দেবেন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লেখেন যে "আমি বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ে সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছি, দেখি এ দৃষ্টান্তে কি ফল হয়?"

১৮৫৭ ও ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বহু স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বাংলার গ্রামাঞ্চলেও স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের সহায়ক হন। হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলাতে এই সকল স্কুল স্থাপিত হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার চেষ্টাতে প্রায় পঞ্চাশটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাদিগের ভরণপোষণ ব্যবস্থার কথা স্মরণ করিয়া "Hindu Family Anuity Fund" সৃষ্টি করেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পরিবারে স্ত্রীশিক্ষা

বিদ্যাসাগর যে সময়ে এই সমস্ত কার্য্যে রত, তখন তাঁহার কর্ম্ম-সহচর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও চুপ করিয়া ছিলেন না। তাঁহার পরিবারের মহিলাদের তিনি অন্তঃপুরে যে শিক্ষা প্রদান করেন, তাহা কালে বহু ফলদায়ক হইয়াছিল।

মহর্ষিদেব যে মহিলাদের বিজ্ঞান শিক্ষা দিবারও পক্ষপাতী ছিলেন তাহার প্রমাণ এই যে, তাঁহার বিদুষী কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী "পৃথিবী" নামক পুস্তক রচনা করিয়া গৃহে যেইরূপ বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।

নারীগণের সাহিত্য-চর্চ্চার অধিকারও দেবেন্দ্রনাথ স্বীকার করিতেন বলিয়া পুত্রবধূ জ্ঞানদানন্দিনী ও কন্যা স্বর্ণকুমারীর "বালক ও ভারতী" ও "বালক" পত্রিকা পরিচালনে সংশ্লিষ্ট থাকা সম্ভবপর হইয়াছিল। স্বর্ণকুমারী ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে "দীপ নির্ব্বাণ" নামক একটি উপন্যাস ও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে "পৃথিবী" নামে একটি বৈজ্ঞানিক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার আরও বহু সুখ্যাত উপন্যাস ছোট গল্প কবিতা প্রভৃতির পুস্তক আছে; লেখিকা হিসাবে তাঁহার স্থান বঙ্গ সাহিত্যে অত্যন্ত উচ্চে।

উত্তরকালে দেবেন্দ্রনাথ জীবিত থাকিতেই উক্ত পরিবারের হিরণ্ময়ী, সরলা ও ইন্দিরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ লাভ করিয়া উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে প্রায় প্রথমদিকেই আপনাদের স্থান করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন।

বাংলার বাহিরে স্ত্রী-শিক্ষা

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে (বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশে) স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর ঠাকুর কল্যাণ সিংহও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ভারতের সেক্রেটারী অফ ষ্টেট ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৬নং ডেস্‌প্যাচে তাঁহার কার্য্যের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন।

বোম্বাই অঞ্চলে সর্ব্ব প্রকার মুক্তি-আন্দোলনের অগ্রদূত নৌরাজি ফার্দ্দিনজি মহাশয় তাঁহার ছাত্র সোরাবজি সাপুরজি, দাদাভাই নৌরাজি, ডি, এন, মাণ্ডলিক প্রভৃতির সহায়তায় "ইয়ং-বম্বে" দল গঠন করিয়া যে আন্দোলন উপস্থিত করেন, তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তার। তিনি "পার্শী গার্লস স্কুল অ্যাসোসিয়েশন" নামক এক সভা স্থাপন করেন। সোরাবজি বাঙ্গালী "পার্শী গার্লস স্কুল" সভার স্কুলগুলি স্থাপনে ফার্দ্দুনজির সহায়তা করা ভিন্ন, নিজ প্রচেষ্টায় বোম্বাই প্রদেশে চারিটি ও নৌসারিতে

"একটি স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহারা 'স্ত্রীবোধ" নামে নারী কল্যাণকর একটি পত্রিকা প্রচার আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে স্ত্রীলোক-দিগের জন্য উচ্চতর শিক্ষার আন্দোলন আরম্ভ করেন মিসেস্ ফ্রান্সিস্না সোরাবজি। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনা শহরে "ভিক্টোরিয়া হাই স্কুল ফর ফিমেল্স" স্থাপন করিয়া স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে যত্নবতী হন।

বিদ্যাসাগরের প্রভাবের বিস্তার

বিদ্যাসাগরের সংস্কার-যুগের আরম্ভের সময়েই বাংলার আর এক শক্তিধর পুরুষ কেশবচন্দ্র আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগদান করেন। ইঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত নারীকল্যাণ-কার্য্য পরে বিশদ ভাবে আলোচনা করা যাইবে। এইখানে এইটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, ইনি যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণে বাহির হন, তখন মানবের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তির আদর্শ তিনি নগরে নগরে এমন ভাবে প্রচার করেন যে তাহার ফলে বোম্বাই মান্দ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে বিভিন্ন জনহিতকর কার্য্যে মানুষ মাতিয়া উঠে এবং তাহার একটি ফলস্বরূপ নারীকল্যাণ-কার্য্যও বোম্বাই আহমেদাবাদ মান্দ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে বেশ জমিয়া উঠে।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর কেশবচন্দ্র প্রথমে পূর্ব্ব বাংলায় ও পরে বোম্বাই ও মান্দ্রাজে গমন করিয়া সমাজ-সংস্কার আন্দোলনকে ঐ সব অঞ্চলে ছড়াইয়া দেন।

কেশবচন্দ্রের অগ্নিময়ী বক্তৃতা শ্রবণে সর্ব্বত্রই যুবকদলের মনে সমাজ-সংস্কারের স্পৃহা জাগিয়া উঠে। সেই বিরাট প্রচেষ্টার বিবরণ পরে বিবৃত হইবে। এইখানে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ঢাকায় নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, সারদাকান্ত ও বরদাকান্ত হালদার প্রভৃতি যুবকবৃন্দ বিধবা বিবাহ প্রদান ও কুলীন কন্যাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া তাহাদের সৎ-পাত্রস্থ করার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন; বরিশালে দুর্গামোহন দাস বিধবাদের

দুঃখমোচনের জন্য আশ্রয় দান ও বিবাহের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন এবং নিজ বাড়ীতে বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন না করিয়া অন্যত্র সেই চেষ্টা করা সঙ্গত নহে বলিয়া আপনার বালবিধবা বিমাতার বিবাহ দিয়া নানাপ্রকার সামাজিক নির্য্যাতন অম্লান বদনে সহ্য করিতে লাগিলেন।

বোম্বাই প্রদেশে আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ তারখুদ ও বাসুদেব বাবাজি নৌরাঙ্গীর নেতৃত্বে বোম্বাই-এর যুবকদল বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্য বিবাহ নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার প্রভৃতি কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন ; ঐ বৎসরই বিষ্ণু পরশুরাম শাস্ত্রী "বিধবা বিবাহ" পুস্তকের মহারাষ্ট্র ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বাসুদেব বাবাজি নৌরাঙ্গী নিজেই কৃষ্ণাবাঈ নাম্নী এক বালবিধবাকে বিবাহ করিয়া বোম্বাই অঞ্চলে প্রথম বিধবা বিবাহ কার্য্য প্রবর্ত্তন করিলেন।

মান্দ্রাজ প্রদেশে যে আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিল তাহার ফলে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কাশীবিশ্বনাথ মুদেলিয়ার "ব্রাহ্মনাটক" নামক এক নাটক রচনা করিয়া বিধবা বিবাহ ও নারীজাতির শিক্ষার সমর্থন করিলেন ও "ব্রাহ্ম দীপিকা" নামক এক পত্রিকা বাহির করিয়া আন্দোলনকে ব্যাপকতর করিয়া তুলিলেন। এই আন্দোলন বীরেশলিঙ্গম পান্তলু গারুর হৃদয় স্পর্শ করাতে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি বিধবা বিবাহ আন্দোলন মান্দ্রাজে এমন ব্যাপক করিয়া তুলিলেন যে, তাঁহাকে ঐ অঞ্চলে 'বিদ্যাসাগর' বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে, বীরেশলিঙ্গম রাজমহেন্দ্রী সহরে বিধবা বিবাহ সমিতি গঠন করেন ও তেলেগু ভাষায় বিধবা বিবাহ সমর্থক শাস্ত্রবাক্য-সমন্বিত পুস্তক রচনা করিয়া প্রচার করেন। তিনি এই পুস্তকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও কাশীর পণ্ডিত বালু শাস্ত্রীর মতগুলিরও বিশদ পর্য্যালোচনা করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতবাদের সহিত তেলেগু ভাষীদের পরিচয় করাইয়া দেন।

চতুর্থ অধ্যায়

কেশবচন্দ্রের যুগ

দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি যখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মারফত এইদেশে প্রবল আন্দোলন তুলিয়াছেন, তখন ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মাত্র উনিশ বৎসর বয়স্ক কিশোর কেশবচন্দ্র আসিয়া এই দলে যোগ দেওয়াতে সংস্কার-বাদী দলের শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি লাভ করে। লোকোত্তর প্রতিভা, অপূর্ব্ব বাগ্মিতা এবং আশ্চর্য্য কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন এই তরুণ কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতেই আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি বৈপ্লবিক বেগে দ্রুত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

"গুড-উইল ফ্রেটারনিটি"

কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার পূর্ব্বেই কয়েকটি আত্মীয় ও বন্ধুর সহায়তায় "গুড-উইল ফ্রেটারনিটি" নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া জনকল্যাণ কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার পরেই এই ফ্রেটারনিটির সভ্যদিগকে লইয়া তিনি ভবানীপুরের উমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের রচিত বিধবা বিবাহ সমর্থক নাটক "বিধবা বিবাহ নাটক" অভিনয় করেন। কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের অভিনয় অত্যন্ত সুন্দর হওয়াতে এই নাটক শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করে ও বিধবা বিবাহের সমর্থনে অনুভূতিকে জাগ্রত করে। কেশবচন্দ্র "Young Bengal, this is for you" নামক এক বক্তৃতা-স্তবকের সাহায্যে বাংলার তরুণদলকে মাতাইয়া তুলিলেন ও "ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকা"য় প্রবন্ধ

লিখিয়া রীতিমত সংস্কার আন্দোলন তুলিলেন। মিরারের যুগ্ম-সম্পাদক মনোমোহন ঘোষ ১৮৬১-৬২ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গে যে অনিষ্টকর দাসী প্রথা তখনও প্রচলিত ছিল, তাহার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালাইতে থাকেন।

মহিলাদিগের সভার আরম্ভ—ভাগলপুর

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কেশব-প্রবর্ত্তিত ঘননিবিষ্ট বন্ধু-সভা "সঙ্গত সভা" অসবর্ণ বিবাহের সমর্থন করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন ও ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ১লা এপ্রিল তারিখে তারকনাথ দত্তের সম্পাদকতায় ব্রাহ্মবন্ধু সভা স্থাপন করিলেন। তারকনাথ ইতিপূর্ব্বেই 'সর্ব্বশুভকরী' সভার বীজস্বরূপ থাকিয়া স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, বিধবাবিবাহ সমর্থন প্রভৃতি নানা নারীহিতসাধন-কার্য্যে লিপ্ত হইয়া এই দায়ীত্বপূর্ণ পদে আপনার যোগ্যতা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মবন্ধু সভা, জেনানা-শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন ও অন্তঃপুরস্থ নারীশিক্ষার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিয়া বেশ সফলতা অর্জ্জন করেন। কেশবচন্দ্রের এই আন্দোলনের পূর্ব্বেই ভাগলপুরের ব্রাহ্ম যুবকদল রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের প্রভাবে ব্রজকিশোর বসু ও অভয়চরণ মল্লিকের নেতৃত্বে নারীমুক্তি আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন ও ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই এইদেশের প্রথম নারী-সভা ভাগলপুর মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসুর জামাতা ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ (অরবিন্দ ঘোষের পিতা) ভাগলপুরে আগমন করিলে ভাগলপুরের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের গতি তাঁহার উৎসাহে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। মিস কলেট ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্ম ইয়ার বুকের ৮২ পৃষ্ঠায় এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"After Babu Krishnadhan Ghose had joined the

(Bhagulpur Brahmo) Samaj, it received a strong impetus to work social reforms. This was directed mainly towards the improvement of the conditions of our women......... There was a Brahmica Samaj, which was regularly attended by the ladies. No efforts were spared to train up the Brahmicas to habits of freedom and to high ideas of religious, moral and social life. The Brahmos also exerted themselves in educating the ladies to enable them to mix respectably in social intercourse.........

In fact, such was the attention paid by the Bhagalpur Brahmos to the improvement of the ladies, that in some quarters their actions were made the subject of unfavourable remarks by other Brahmos who could not properly appreciate them.

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রদত্ত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক বক্তৃতা হইতে জানা যায়—

"Long before the Brahmica Samaj of Calcutta, similar Samaj was established at Barisal and Bhagalpore. K. C. Sen instead of being the actual leader was led by his young friends. [Brahmo Public Opinion, May 1, 1879]

ভাগলপুরের ব্রাহ্মবন্ধু দলের এই প্রচেষ্টা সমাজ কল্যাণকর বলিয়া কেশবচন্দ্রের বোধ হওয়াতে এই আন্দোলন ভারতময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতে তিনি সঙ্কল্প করেন এবং তাঁহারই প্রাথমিক প্রচেষ্টারূপে ব্রাহ্মবন্ধু সভার কার্যক্রম স্থিরীকৃত হয়।

বামাবোধিনী পত্রিকা

ব্রাহ্মবন্ধু সভার উৎসাহী সদস্য উমেশচন্দ্র দত্ত (পরে সিটি কলেজের অধ্যক্ষ, সাধুতার জন্য প্রসিদ্ধ সাধু উমেশচন্দ্র) মহিলাদের জন্য বামাবোধিনী

পত্রিকা নামে পত্রিকা ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বামাবোধিনী সভার পক্ষ হইতে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়া দেন। এই পত্রিকাতেই এইদেশের মহিলাদের বাঙ্গলা সাহিত্যের সাধনা সংঘবদ্ধ ভাবে আরম্ভ হয় ও মহিলারা প্রথম লেখিকা হইবার সুবিধা অর্জ্জন করেন। সেইজন্য বামাবোধিনী পত্রিকার প্রচার-আরম্ভকে নারীকল্যাণ-যজ্ঞের একটি নবযুগের প্রারম্ভ বলা যায়। ইহার পূর্ব্বে কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য "মাসিক পত্রিকা" নামে একখানি মাসিক পত্র ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের সম্পাদকতায় বাহির হইয়াছিল কিন্তু তাহা মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে প্রকাশিত হইলেও মহিলাদের লেখা ইহাতে প্রকাশিত হয় নাই। বামাবোধিনী পত্রিকার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে মহিলা লেখিকার রচনাবলী বিশেষ স্থান পাইয়াছিল।

বামাবোধিনী পত্রিকা মহিলাগণকে সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী করিবার জন্য রীতিমত চেষ্টা করে। উক্ত পত্রিকার প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় এই বিজ্ঞাপনটিই এইরূপ প্রচেষ্টার প্রকৃষ্ট প্রমাণ —

বি জ্ঞা প ন

"বামাবোধিনী সভাতে স্ত্রীলোকদিগের লেখা সমাদরপূর্ব্বক গৃহীত হইবে এবং যোগ্য বোধ হইলে পত্রিকাতে প্রকাশ করা যাইবে। লেখিকাগণ সম্পাদকের নিকট স্ব স্ব নাম ধাম সম্বলিত পত্র প্রেরণ করিবেন।"

বামাবোধিনী সভা হইতে মহিলা লেখিকাগণকে পুরস্কৃত করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছিল। বামাবোধিনী পত্রিকায় দ্বিতীয় বর্ষের মাঘ-সংখ্যায় দেখা যায়, স্কুলের বালিকাগণকে পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা থাকিলেও অন্য বামাদের শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ দানের জন্য পুরস্কার দানের ব্যবস্থা না

থাকায় সেই অভাব দূরীকরণের জন্য প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচয়িতাকে পুরস্কার দান ও পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি বিচারের ভার দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, প্যারীচরণ মিত্র ও কেশবচন্দ্র সেনের উপর অর্পিত হইয়াছিল। এই সভা হইতে নারীদিগের রচিত উৎকৃষ্ট রচনাগুলি "বামারচনাবলী" নামে পুস্তকাকারে বাহির করা হইত। তাহা হইতে অনেকে লিখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন ও উত্তরকালে সুলেখিকারূপে পরিচিত হন।

পূর্ব্ববঙ্গে নারী-আন্দোলন

আন্দোলনের ঢেউ পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা ও বরিশালে পৌছাইলে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ বরিশালে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন দুর্গামোহন দাস ও লাখুটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র রায়।

রামতনু লাহিড়ী মহাশয় সেই সময়ে বরিশালে শিক্ষকতা করিতেছিলেন; দুর্গামোহন ও রাখালচন্দ্র তাঁহার প্রভাবেই নারীকল্যাণ কল্পে ব্রতী হয়েন। ইহাদের মনে যে বৈপ্লবিক কর্ম্মপন্থা জাগে তাহাতে এই ব্রতে ইঁহারা অবতীর্ণ হইবার পরেই যে সমস্ত গতি অগ্রগতিপূর্ণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা সহ্য করা সংস্কারক দলের পক্ষেও কঠিন হইয়া উঠে। দুর্গামোহন যখনই বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিলেন, তখনই আপনার বালবিধবা বিমাতার বিবাহ না দিলে এই সংস্কার কার্য্যে প্রবেশ করা তাঁহার পক্ষে উচিত হইবে না বোধে অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত বিমাতার বিবাহে উদ্যোগী হইয়া উঠেন ও বরিশালের এক বৈদ্য বংশোদ্ভব তরুণ চিকিৎসকের সহিত আপন বিমাতার বিবাহ দিলেন।

এদিকে ঢাকার এক তরুণ যুবক পার্ব্বতীচরণ দাসগুপ্ত ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ২রা আগষ্ট গুরুচরণ দাস নামক এক বৈষ্ণবের কামিনী নাম্নী এক বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া একাধারে বিধবা ও অসবর্ণা বিবাহ করিয়া সমাজ-সংস্কার আন্দোলনকে তীব্র করিয়া তুলেন। ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা একটু রক্ষণশীল মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন তাঁহারা দুর্গামোহন বাবুর ও পার্ব্বতীচরণের এই 'অতি অগ্রসর' সংস্কারে ভীত হইয়া এই সব কার্য্যের প্রতিবাদ করিলেন এই বলিয়া যে, এত দ্রুতভাবে অগ্রসর হইলে সমাজে যে বিক্ষোভ জাগিবে তাহাতে সংস্কার কার্য্য পণ্ড হইয়া যাইবে ; বৈপ্লবিক কর্ম্মপন্থা গ্রহণ না করিয়া ধীর মন্থরতার সহিত সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হওয়াই যে বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন সংস্কারকের পক্ষে উচিত, এই মত ইঁহারা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।

কার্পেণ্টারের ভারত আগমনে আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ভারতহিতৈষী ও নারীকল্যাণব্রতী মহিলা মিস মেরী কার্পেণ্টার এইদেশে আগমন করেন ও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কেশবচন্দ্র পূর্ব্ববাংলা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে পরিভ্রমণ করেন।

কার্পেণ্টার মান্দ্রাজ শহরে নারীশিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ভারতের নারীদিগের সেবাব্রতে ব্রতী হইতে তিনি—রামমোহন রায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মনোমোহন ঘোষের নিকট অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া ছিলেন।*

এই সময়ে কলিকাতায় মিস কার্পেণ্টারের অভ্যর্থনার জন্য যে মজলিসের আয়োজন হইয়াছিল, সেই মজলিসে গুরুচরণ মহালনবিশ প্রমুখ

* Vide Address to the Hindus delivered in India Longmans 1867 pp. 48.

কয়েকজন তরুণ আপন আপন পত্নীদের সহিত নিজ বন্ধুদের প্রকাশ্যে আলাপ পরিচয় করাইয়া দেন। ইহার কয়েকদিন পূর্ব্বে. বরিশালে রাখাল রায় মহাশয় তাঁহার পত্নীকে লইয়া তথাকার এক উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীর বাড়ীতে নৈশ আহারে গিয়াছিলেন ও গুরুচরণ মহলানবিশের দল কলিকাতায় প্রকাশ্য রাজপথে নিজ নিজ পত্নীদের সঙ্গে লইয়া পদব্রজে ভ্রমণে বাহির হইতেন। বাঙালী মহিলাদের তখনকার পরিচ্ছদ প্রকাশ্যে বাহির হইবার উপযোগী ছিল না বলিয়া তাঁহারা বিলাতী গাউনের উপর আঁচলা জুড়িয়া আধ বিলাতী আধা দেশী একপ্রকার 'জগাখিচুড়ি' পরিচ্ছদ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিলেন। বোম্বাই প্রদেশে ব্যবহৃত পার্শী শাড়ীর রকমফের করিয়া যে শাড়া পরিধান প্রথা আজকাল বাংলার নারীসমাজের পরিচ্ছদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই পরিচ্ছদ ইহার কয়েক বৎসর পর আবিষ্কার করেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। তাঁহার বোম্বাই প্রবাসকালে ও ঠাকুর পরিবারের চেষ্টাতেই উহা বাংলাদেশে প্রথম চল হয়।

রাখালচন্দ্র ও গুরুচরণের এই অতি অগ্রসর সংস্কার কেশবচন্দ্রের পছন্দমত হয় নাই এবং তিনি 'মিরর' পত্রিকায়—এই সমস্ত অতি উৎসাহ সুফলপ্রসূ হয় না—বলিয়া ইহাদের মৃদু তিরস্কার পর্য্যন্ত করেন।

কেশবচন্দ্রের ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ভারতভ্রমণ, সমাজ সংস্কার কার্য্যকে কতদূর আগাইয়া দিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই, কেশবচন্দ্র মহিলাদের জন্য "ব্রাহ্মিকা সমাজ" নামক সভা স্থাপন করিয়া মহিলাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, প্রবন্ধ পাঠ, তর্ক প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সম্প্রদান প্রথার বিরোধিতা

এদিকে পার্ব্বতীচরণের বিবাহ ভিন্ন, কেশবচন্দ্রের অত্যন্ত অনুরাগী শিষ্য প্রসন্নকুমার সেন মহাশয়ও ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে, শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী মৈত্র নাম্নী এক ব্রাহ্মণকন্যাকে ব্রাহ্ম-পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করেন। ব্রাহ্মসমাজের রক্ষণশীল দল অসবর্ণ বিবাহ পছন্দ করিতেন না; তাঁহারা—এই সমস্ত বিবাহ আইনত সিদ্ধ কি না—প্রশ্ন তুলাতে ভারতের অ্যাডভোকেট জেনারেল টি, এইচ, কাউই (T. H. Cowie) অভিমত প্রদান করেন যে, উহা সিদ্ধ নহে। কেশববাবু অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন; সেজন্য এরূপ বিবাহ আইনসিদ্ধ করিবার জন্য, বিশেষ বিবাহ-বিধি প্রবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন তুলিলেন।

প্রসন্ন কুমার সেনের বিবাহ আর একটি বিশেষ ঘটনার জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই বিবাহেই সর্ব্বপ্রথমে সম্প্রদানের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মে, অর্থে ও কামে পরস্পরকে অতিক্রম না করিবার বর ও বধুর পরস্পরের বিবাহ-প্রতিজ্ঞা প্রবর্ত্তিত হইয়া বধূকে দান সামগ্রী হইতে স্বয়ং মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে।

ব্রাহ্মবিবাহ বিল আন্দোলন

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে, কেশবচন্দ্রের আহ্বানে ব্রাহ্মগণ সমবেত হইয়া ব্রাহ্ম-বিবাহ সিদ্ধ করিবার জন্য ভারত সরকারের নিকট আবেদন প্রেরণের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর, মেইন সাহেব "The Native Marriage Bill" নামে একটি বিল, আইন-সভায় উপস্থিত করিয়া এরূপ বিবাহ আইনতঃ সিদ্ধ করিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা

সফল হয় না। "ব্রাহ্মসমাজ খুব দৃঢ়প্রতিষ্ঠ ও সুসংবদ্ধ নহে", এই আপত্তিতে ব্রাহ্ম-বিবাহ আইন সেবার সফল হইল না। দেশে যখন এই প্রকারে নারী-আন্দোলন চলিতেছিল, সেই সময়ে কেশবচন্দ্র ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে, ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে, ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া "Social Reform Association" নামক সভা স্থাপন করিয়া এদেশে সুলভ সংবাদ পত্র "সুলভ সমাচার", নৈশ বিদ্যালয়, শ্রমজীবী বিদ্যালয়, নারীশিক্ষা আয়তন প্রভৃতি নানা জনকল্যাণকর কার্য্যের সূচনা করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে এদেশে দুর্গামোহন, গুরুচরণ, অন্নদা খাস্তগির, রাখাল চন্দ্র রায়ের সহিত বিক্রমপুর হইতে আগত "অবলাবান্ধব" দ্বারকানাথের সংযোগ ঘটাতে, 'অতি অগ্রসর নারীপ্রগতির সমর্থক দল এত শক্তিশালী হইয়া উঠেন যে, নারী-আন্দোলন তাঁহাদেরই প্রভাবাধীনে আসিয়া আর একটি নবযুগের সূচনা করে। তবুও কেশবচন্দ্র এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এমন দুইটি কীর্ত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হন যে, তাঁহার নাম নারী-কল্যাণব্রতী হিসাবে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

কেশবচন্দ্র এদেশে আসিয়াই ব্রাহ্মবিবাহ সিদ্ধ করিবার আন্দোলন আরম্ভ করিতে মনস্থ করেন এবং তজ্জন্য নারীর সর্ব্বনিম্নতম বিবাহের বয়স স্থির করিবার জন্য এদেশের চিকিৎসকগণের অভিমত সংগ্রহে যত্নবান হন। তাঁহার সার্কুলারের উত্তরে ডাক্তার চন্দ্রকুমার দে ও ডাক্তার চার্লস্ উহা চতুর্দ্দশ বৎসর; নবীনবাবু, পঞ্চদশ বৎসর; তামিজুদ্দিন, মহেন্দ্রলাল সরকার ও গুডিভ চক্রবর্ত্তী—ষোড়শ বৎসর ও বোম্বাই প্রদেশের প্রসিদ্ধ সংস্কারক ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ—বিংশতি বৎসর বলিয়া অভিমত প্রদান করেন। লোকবাধা যাহাতে বেশী না হয় সেজন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সর্ব্ব নিম্নতম বয়স বলিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন,

তাহাকেই, অর্থাৎ চতুর্দ্দশ বৎসর সর্ব্ব নিম্নতম বিবাহের কাল বলিয়া গ্রহণ করিয়া, কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম-বিবাহ অনুষ্ঠান করিবার নির্দ্দেশ প্রদান করেন। তাঁহার চেষ্টায় আইন-সচিব স্যার জেম্স ফিটজেম্স ষ্টিফেন আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য বিল আনয়ন করেন, কিন্তু নবগোপাল মিত্র প্রমুখ রক্ষণশীল আদি-ব্রাহ্মসমাজ-নায়কগণের বিরোধিতায় 'ব্রাহ্ম-বিবাহ বিল' রূপে উহা গৃহীত না হইয়া 'বিশেষ বিবাহ বিল' রূপে গৃহীত হয়। এই আইন অনুসারে বিবাহ সিদ্ধ করিতে হইলে সর্ব্বনিম্নতম বয়স—কন্যার চতুর্দ্দশ বৎসর ও পুরুষের অষ্টাদশ বৎসর হওয়ার প্রয়োজন এবং প্রাপ্ত বয়স্কের (অর্থাৎ একবিংশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর) নিজ অভিমত ও তন্নিম্ন বয়স্কের অভিভাবকের মত প্রয়োজন। এই বিবাহে বিচ্ছেদ-বিধি (ডাইভোর্স) থাকায় নারীজাতি আর একটি অধিকার লাভ করে।

কেশবচন্দ্রের নারীকল্যাণ-যজ্ঞ এইরূপে সফলতা লাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছে।

গুজরাটের কর্ম্মবীর মূলজী

এই যুগে বোম্বাই প্রদেশের একজন সমাজসংস্কারকও তাঁহার কর্ম্ম-প্রচেষ্টার জন্য নারী-কল্যাণ ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন—ইনি প্রসিদ্ধ গুজরাটি সমাজসংস্কারক কর্সনদাস মুলজী।

ইনি "সত্যপ্রকাশক" নামক পত্রিকা বাহির করিয়া নানা সমাজসংস্কার-মূলক কার্য্যে যখন লিপ্ত ছিলেন, তখন ভাটিয়া ও বেনিয়া সমাজের এক কুৎসিত প্রথা নিবারণ করা প্রয়োজন অনুভব করেন,—তাহা হইল, বল্লভাচারী সম্প্রদায়ে প্রচলিত 'গুরুগ্রাম' প্রথা। বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের "মহারাজ" নামক কুলগুরুগণ শিষ্যের "তনু-মন ধন" এর অভিভাবক

ছিলেন। এই অভিভাবকত্বের সীমারেখা বাড়াইতে বাড়াইতে 'মহারাজ'গণ শেষকালে এইরূপ একটি কুৎসিত প্রথার সৃষ্টি করেন যে, শিষ্য বিবাহের পর আপন নব পরিণীতা বধূকে সর্ব্বাগ্রে গুরুর ভোগ-বিলাস চরিতার্থের জন্য প্রেরণ করিবেন এবং তাহার পর পত্নীকে 'প্রসাদ' রূপে গ্রহণ করিবেন।

কার্সনদাস এই প্রথাকে তীব্র আক্রমণ করিয়া অগ্নিগর্ভ প্রবন্ধ সকল লিখিতে থাকেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে, মহারাজগণ কার্সনদাসকে একঘরে করিবার চেষ্টা পান। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে, সুরাটের জনৈক 'মহারাজ' সত্যপ্রকাশের সম্পাদকের নামে মানহানির নালিশ রুজু করেন। মুলজী আদালতে নির্ভীকভাবে ঘোষণা করেন যে,—বল্লভাচারী গুরুগণ ব্যাভিচারী এবং সুরাটের মহারাজও এরূপ ব্যাভিচারে লিপ্ত থাকেন। এই সামাজিক কুপ্রথার উচ্ছেদ কামনা করা অপরাধ হইতে পারে না, সেজন্য তিনি নির্দ্দোষী।

চল্লিশদিন বিচারের পর সুপ্রিম কোর্টের স্যার জোসেফ আর্নল্ড কার্সনদাস মুলজীকে বেকসুর খালাস প্রদান করেন ও তাঁহার সৎসাহসের অত্যন্ত প্রশংসা করেন। বিচার চলিতে থাকাকালে, একদল গুণ্ডা কাসনদাসকে আদালত হইতে বাহির হইবার সময় গুরুতর ভাবে জখম করে। কার্সনদাসকে নানাভাবে নির্য্যাতনের চেষ্টা গুরুর দল বরাবরই করিতে থাকিলেও তিনি বরাবরই অটল ছিলেন। কিন্তু নির্য্যাতনে মন সবল থাকিলেও দেহ ভাঙ্গিয়া গেল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে, ভগ্নস্বাস্থ্য মহাপ্রাণ কার্সনদাস মুলজী মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। স্যার রিচার্ড টেম্পল তাঁহার "Men And Events Of My Time In India" পুস্তকে তাঁহার সম্পর্কে লিখিয়াছেন:

'Kursendas exposed this fell plague spot before the public with a persistency and moral courage which can be appreciated only by those who know that moral coercion and social torments can in a Hindu community be brought to bear upon recalcitrant individual . . . his life was probably shortened by the agitation of the controversy. However fateful may be the details of the immorality which he bravely combated, his career forms an episode deserving the best attention of moralists and reformers."

মান্দ্রাজে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার

মেরি কার্পেণ্টারের ভারত ভ্রমণের অন্যতম সুফল হইতেছে, ভারতময় স্ত্রী শিক্ষা আন্দোলনের বিস্তার, গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে মহিলা শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার জন্য নর্ম্মাল স্কুল স্থাপন ও নর্ম্ম্যাল পরীক্ষা প্রবর্ত্তন। স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে মান্দ্রাজ, বাংলা ও বোম্বাই এর অনেক পশ্চাতে ছিল। মেরী কার্পেণ্টারের মান্দ্রাজ ভ্রমণের পর তাঁহার উদ্যোগেই সে প্রদেশে নারী শিক্ষার ব্যাপকতা ঘটে। কিন্তু তাহাতেও বহুদিন মান্দ্রাজ বাংলা ও বোম্বাই হইতে অনেক পশ্চাতে থাকে। এ সম্পর্কে ডাক্তার সত্যনাথ তাঁহার 'History Of Education In Madras Presidency' নামক পুস্তকে বেশ সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে,

"It was only in 1866 that the subject of female education came under the serious consideration of Government, though previous to that year the several missions

had taken practical steps towards the establishment of elementary schools for girls. The subject of course, naturally for many years past, engaged the attention of educated natives, but omitting the establishment of a few schools, in which elementary instruction was conveyed to girls of tender age by male teachers, the results were rather in words than acts. A stimulus was afforded to female education by a visit from Miss Carpenter, whose philanthropic exertions in England to improve the more neglected section of the community were well known." (History Of Education In The Madras Presidency. pp. 73।."

কার্পেণ্টারের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায়, বিজয় নগরের মহারাজা তাঁহার জমিদারীর বালিকাদের শিক্ষাবিস্তারের জন্য, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে, উদ্যোগী হইলেন ও তহবিল হইতে বাৎসরিক বারো হাজার টাকা মঞ্জুর করিলেন। মাদ্রাজ সরকারেরও আর চুপ করিয়া থাকা চলিল না, তাঁহারাও ঐ বৎসর প্রদেশে নরম্যাল ফিমেল স্কুল স্থাপনের জন্য বাৎসরিক বার হাজার টাকা বরাদ্দ করিলেন, কিন্তু সরকারী কাজ অত্যন্ত ঢিমেতালে চলিল। স্কুল খুলিতেই ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দেরী হইল। ঐ তারিখে মিস বেনের অধ্যক্ষতায় প্রথম স্কুল খোলা হয়। ডাক্তার সত্যনাথ লিখিয়াছেন যে,

"It is right to notice here that the efforts that the Maharaj of Vizianagram made to encourage female education on his estates. In 1868 he established a School at Vizianagram for Rajpoot and Brahmin girls at an annual cost of about 12000 Rupees." (History of Education In The Madras Presidency. pp. 75)

কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও, প্রথম দশ বৎসর মান্দ্রাজে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার তেমন আশানুরূপ হয় নাই। ১৮৮০-৮১ খৃষ্টাব্দে, মান্দ্রাজের ডাইরেক্টর অফ পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাকসনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে,—এখানকার স্কুলগুলিকে প্রকৃতপক্ষে ফিরিঙ্গি ও ইংরেজ বালিকাদের বিদ্যালয় বলা চলে, কারণ এসব স্কুলে যে সব ছাত্রী এই দশ বৎসর শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহার মধ্যে বাট জন মাত্র হিন্দু ছাত্রী ছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

দ্বারকানাথের যুগ

কেশবচন্দ্রের নারীমঙ্গল অনুষ্ঠানের ধীরগতিতে অসহিষ্ণু হইয়া যে প্রগতিবাদী দল এদেশে অত্যগ্রসর নারী প্রগতি আন্দোলন আরম্ভ করেন, তাঁহাদের নেতা হন—বিক্রমপুরবাসী কুলীন ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব "অবলা বান্ধব" দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

দ্বারকানাথ যখন কালীপাড়া স্কুলের ছাত্র, তখন অক্ষয়চন্দ্র দত্তের "মানব মনের সহিত বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধ বিচার" গ্রন্থপাঠে তাঁহার মনে যে সমাজ সংস্কারের স্পৃহা জাগে, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান দ্বারকানাথ বাল্যে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন; অকুলীনের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিলে পাতিত্য দোষ ঘটে, এই বিশ্বাসের বশে তাঁহাকে প্রায়ই নিজ হস্তে অন্ন পাক করিয়া খাইতে হইত। একটি মর্ম্মান্তিক ঘটনা এহেন সনাতনী দ্বারকানাথের জীবনে বিপর্য্যয় ঘটায়।

কুলীন কন্যার দুঃখ ও দ্বারকানাথের জাগৃতি

যখন দ্বারকানাথের বয়স মাত্র সপ্তদশ বৎসর, তখন তাঁহার নিজ গ্রাম মাগুরখণ্ডে, তাঁহার অত্যন্ত পরিচিত ও প্রিয়ভাজন এক কুলীন কন্যাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। দ্বারকানাথ মানুষের এই নৃশংস বর্ব্বরতার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে, কুলীন কন্যাদিগকে বধ করা তখনকার দিনে বিরল ছিল না। তৎকালে কুল মর্য্যাদার হানির ভয়ে অকুলীনকে কন্যা সম্প্রদান করা চলিত না বলিয়া বহু কুলীন কন্যাকে

অবিবাহিত জীবন যাপন করিতে হইত, অথবা বহুদার স্বামীকে বিবাহ করিতে, এমন কি অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিকে বিবাহ করিতেও বাধ্য করা হইত। সেজন্য যৌবনের তাড়না বহু কুলীন কন্যাকে কলঙ্কময় জীবন পথে টানিয়া লইত। সামাজিক কলঙ্ক এড়াইবার জন্য, সময়ে সময়ে ইহাদের হত্যা করা সে সময়ে সমাজে চল হইয়া গিয়াছিল। দ্বারকানাথ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে, তাঁহার স্বগ্রামেই দশ বৎসরের মধ্যে—বত্রিশ-তেত্রিশটি কুলীন কন্যাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হইয়াছে এবং সহসা কলেরার আক্রমণে তাঁহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে, এইকথা রটনা করিয়া হত্যাকারীরা আইনকে ফাঁকি দিয়াছে। তখন পুলিসের শাসন গ্রামে এত প্রবল হয় নাই এবং মৃত্যুর কারণ লইয়াও তেমন তদন্ত সম্ভবপর ছিল না বলিয়া এরূপ আচরণ বেশ অবাধে চলিতে পারিত।

এরূপ মর্ম্মান্তিক ঘটনার অবসান ঘটাইতে দ্বারকানাথ দৃঢ়-সঙ্কল্প হইলেন এবং সেজন্য তুমুল আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। কুলীনপ্রথা-জনিত কন্যা-হত্যা রূপ দুরপনেয় কলঙ্ক চিরতরে বিদূরিত করিবার উদ্দেশ্যকেই মুখ্য করিয়া দ্বারকানাথ 'অবলাবান্ধব' পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। 'অবলাবান্ধবের' জন্মবৃত্তান্ত তিনি নিজেই উক্ত পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "অবলাবান্ধব' বহু চেষ্টা করিয়াও পাই নাই, কিন্তু দ্বারকানাথের দেহাবসান ঘটিলে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা তাঁহার যে সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই প্রকাশ করেন, তাহাতে 'অবলাবান্ধব' হইতে সেই অংশটি উদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহা হইতে এই স্থানে উহা পুনরুদ্ধার করিয়া দিতেছি।—

"এদেশীয় কুল কন্যাগণ জীবনে যে বিষম দুঃখ দুর্গতি ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা যাহাদিগের চক্ষু আছে, তাঁহাদের অগোচর নাই। কিন্তু যাঁহারা চক্ষু থাকিতে অন্ধ, তাঁহারা ইহা দেখিতে পান না। যদি একটি

হৃদয় বিদারক ঘটনা আমাদিগের চক্ষু প্রস্ফূটিত না করিত, হয়ত আমরাও আজীবন অন্ধই থাকিতাম। একটী পরমা সুন্দরী যুবতী কুলীন কন্যাকে তাঁহার আত্মীয়েরা বিষ প্রয়োগ করিয়া হত্যা করেন। তখন আমাদিগের বয়স সপ্তদশ বর্ষ। লোক পরম্পরায় এই ঘটনা আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইল। এইরূপে যাহার অপমৃত্যু ঘটিল, আমরা তাহাকে জানিতাম, সুতরাং আমাদিগের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল। আমাদিগের জনৈক সমবয়স্ক ব্যক্তির নিকট শুনিতে পাইলাম, এরূপ ঘটনা বিরল নহে, প্রায় প্রতি বর্ষেই ঘটিয়া থাকে। অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া জানিলাম, তাঁহার কথা সত্য; তৎপূর্ব্ব সপ্তদশ বৎসরে একটি গ্রাম হইতে ৩২।৩৩টি স্ত্রীলোকের এইরূপে মৃত্যু হইয়াছে। মানুষের হৃদয় এককালে পাষাণ না হইলে, এ অবস্থায় দ্রব না হইয়া পারে না। আমরা বাল্যকালে চাণক্য পণ্ডিতের শ্লোক সকল পাঠ করিয়া স্ত্রীজাতির ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলাম। তাহাদিগকে সর্ব্বদা বিদ্রূপ ও উপহাস করিতে আমাদিগের আমোদ বোধ হইত। কিন্তু তখন বুঝিলাম, ইহারা উপহাসের পাত্র নহে, কৃপার সামগ্রী। এই সময় হইতে স্ত্রীজাতির প্রতি আমাদিগের মমতা জন্মিল। তখন ভাবিলাম, যদি বিন্দু পরিমাণেও ইহাদের এই দুঃখ দুর্গতি দূর করিতে পারি, জীবন সার্থক হইবে। এই অভিপ্রায়েই অবলাবান্ধবের জন্ম হয়।"

বিক্রমপুর পরগণায় অনেক যুবক আসিয়া দ্বারকানাথের সহায় হইলেন—তন্মধ্যে উত্তরকালে, সারদাকান্ত ও বরদাকান্ত হালদার, নবকান্ত, শীতলাকান্ত নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এই যুবকদল বিপন্ন কুলীন কন্যাদের উদ্ধার করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করিয়া তাহাদের সুপাত্রে অর্পণ করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এইকাজে তাঁহারা বহুবার নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করিয়াছেন এবং রাজদ্বারেও কেহ কেহ অভিযুক্ত হইয়াছেন।

এইরূপ একটি ব্রাহ্মণ কন্যা—স্বর্ণলতা দেবীর সহিত পার্ব্বতীচরণ দাসগুপ্তের দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। পার্ব্বতীচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন; তাঁহার বিবাহে ছাত্র মহলে আন্দোলন আরও তীব্র হইয়া উঠে।

অবলা বান্ধব

দ্বারকানাথের বয়স যখন পঁচিশ বৎসর, তখন তিনি ফরিদপুরের অন্তর্গত লোনসিংহ গ্রামে শিক্ষকতা করিতেন; এই সময়ে (১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে) 'অবলাবান্ধব' নামে এক পাক্ষিক পত্রিকা বাহির করিতে লাগিলেন। স্ত্রীজাতির অধিকার প্রতিপন্ন করিয়া, দ্বারকানাথ প্রতিসংখ্যা 'অবলা-বান্ধবে' অনল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারের সহিত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এগুলিকে তুলনা করিয়াছেন। 'অবলাবান্ধব' ঢাকার ও কলিকাতার ছাত্রদের মধ্যে তুমুল আন্দোলন জাগাইয়া তুলিল।

কলিকাতার ছাত্রদলের নায়ক, সংস্কৃত কলেজের ছাত্র শিবনাথ ভট্টাচার্য্য (পরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী) ও উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পরে লেফটেন্যান্ট উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) দ্বারকানাথকে কলিকাতায় আসিতে পত্রযোগে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কলিকাতা অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে অনুকূল হইবে এই প্রত্যয়ে, দৃঢ়-ব্রত দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান দ্বারকানাথ, প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে, কলিকাতায় আসিলেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার আত্মচরিতে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে—

"একদিন কলেজে পড়িতেছি, এমন সময় উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আসিয়া আমাকে বলিল, "ওরে ভাই অবলা-বান্ধবের এডিটার কলিকাতায় এসেছে,

আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এখানে এসেছে। অমনি আমাদের 'হিরো'কে দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। গিয়া দেখি এক দীর্ঘাকৃতি একহারা পুরুষ, স্কুল মাষ্টারের মত লম্বা চাপকান পরা, দাঁড়াইয়া আছে। তিনিই দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়......কিছুদিন পরেই তিনি অবলাবান্ধব লইয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং পূর্ব্ববঙ্গের যুবকদিগের নেতা স্বরূপ হইয়া ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রী স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিলেন।"

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে, 'ব্রাহ্ম পাব্লিক ওপিনিয়নে' 'অবলা-বান্ধবের' একটি সংখ্যার সূচীপত্র আছে। সেই সূচী হইতেই এই নারীপাঠ্য পত্রিকা সে সময়ের পক্ষে কত অগ্রগামী ছিল তাহা বুঝা যায়। সূচীপত্রটি এইরূপ :

প্রথম প্রবন্ধ : শিক্ষা—শিক্ষণীয় বিষয় কি হওয়া উচিত (ক) আত্ম-রক্ষার্থে শিক্ষা (খ) জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অর্থকরী বিদ্যা (গ) সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শিক্ষা। দ্বিতীয় প্রবন্ধ : যবনগণের সংস্কৃত জ্ঞান। তৃতীয় প্রবন্ধ : ওহাবী ধর্ম্ম ও রফিক মণ্ডল এবং আমিরুদ্দিন। চতুর্থ প্রবন্ধ : এডিসন ও বৈদ্যুতিক আলোক। পঞ্চম প্রবন্ধ : টেলিফোন, মাইক্রোফোন ও ফনোগ্রাফ। ষষ্ঠ প্রবন্ধ : কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী। সপ্তম প্রবন্ধ : বিবিধ প্রসঙ্গ।

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়

দ্বারকানাথ ব্যতীত বিক্রমপুরের অন্য একজন কুলীন ব্রাহ্মণও এই সময়ে কুলকন্যাদের দুঃখমোচনের জন্য নানা প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। ইনি অনেকগুলি বিদ্রূপাত্মক সঙ্গীত রচনা করিয়া, বহুদারগ্রহণকারী বৃদ্ধ কুলীনদিগকে উপহসিত করিয়া তুলেন এবং করুণ রসের সঙ্গীত রচনা করিয়া কুলকন্যাদের দুঃখ সম্বন্ধে

সমাজকে সচেতন করিয়া তুলিতে যত্নবান হন। তাঁহার এই সমস্ত সঙ্গীত সেই সময়ে খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল।

নারী মঙ্গলে অগ্রসর দল

দ্বারকানাথ কলিকাতায় আসিয়াই, দুর্গামোহন দাস, অন্নদাচরণ খাস্তগির (দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মাতামহ), গুরুচরণ মহলানবিশ প্রভৃতি ব্রাহ্ম প্রগতিবাদীদের ও মনোমোহন ঘোষের ন্যায় একজন শক্তিশালী নায়কের সহায়তায়, একটি অতি শক্তিশালী সংঘ গঠন করিয়া 'অবলাবান্ধব' পরিচালনার সহিত কার্য্যকরী নারীমঙ্গল অনুষ্ঠান স্থাপনে তৎপর হইলেন।

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে নারীগণের বসিবার স্থান পর্দ্দার আড়ালে ছিল। দুর্গামোহন, অন্নদাচরণ, গুরুচরণ ও দ্বারকানাথ,—পর্দ্দার অন্তরালের বাহিরে নারীদিগের বসিবার বাসনা হইলে, তাহার ব্যবস্থা করিতে, কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইলেন এবং নিজ নিজ পরিবার সহ বাহিরে সকলের বসিবার স্থানে আসিয়া বসিলেন। সমাজে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কেশবচন্দ্র এই ব্যবস্থার অনুমোদন না করায় প্রগতিবাদিগণ স্বতন্ত্র হইয়া অন্নদাচরণের গৃহে এক নূতন সমাজ স্থাপন করিয়া উপাসনার ব্যবস্থা করিলেন। পর্দ্দার বাহিরে বসিবার ব্যবস্থায় কেশবচন্দ্রের নিজের আপত্তি ছিল না, তবে সকলকে লইয়া চলিবার জন্যই তাঁহার আপত্তি ছিল। তিনি বিরোধ মিটাইয়া ফেলিলেন এবং পর্দ্দার বাহিরে বসিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

বিধুমুখী হরণ মামলা

ইতিমধ্যে বিক্রমপুরের বরদা হালদার মহাশয়ের এক নিকট আত্মীয়া (পিসতুত-ভগিনী দুর্গাসুন্দরীর কন্যা) বিধুমুখী মুখোপাধ্যায়ের সহিত

তেরটি স্ত্রী বর্ত্তমান এমন একজন অতি বৃদ্ধের সহিত বিবাহ, বিধুমুখীর অভিভাবক ও বরদাবাবুর পিতৃব্য শ্রীনাথ হালদার স্থির করেন। এই বিবাহ পণ্ড করিবার উদ্দেশ্যে, সারদানাথ ও বরদানাথ বিধুমুখীর সম্মতিক্রমে তাঁহাকে লইয়া গোপনে পলায়ন করেন। বিধুমুখীর অভিভাবকগণ পুলিসের সহায়তায় ষ্টেশনে ষ্টেশনে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কিন্তু হালদার ভ্রাতৃদ্বয় বিধুমুখীকে সরাসরি কলিকাতায় না আনিয়া বরিশালে দুর্গামোহনের গৃহে লইয়া যাওয়াতে, ইঁহাদিগকে ধরিবার চেষ্টা বিফল হয়। কিন্তু অভিভাবকবর্গ হাইকোর্টে হালদারদিগের নামে নারীহরণের মোকর্দ্দমা জুড়িয়া দেন। বরদা হালদার ও তাহার সহায়রূপে কথিত প্রসন্ন গুপ্তের জন্য ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেটের গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারি হয়। বরদার পক্ষ হইতেও,—বিধুমুখীর মঙ্গলের জন্য তাঁহাকে আনা হইয়াছে এবং অভিভাবক প্রকৃত অভিভাবকের ন্যায় কার্য্য না করাতে ঐ অধিকার হইতে চ্যুত হইবার যোগ্য—বলিয়া ঘোষণার জন্য, হাইকোর্টে আবেদন করা হয়। ১৮৭০। খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর, বিচারপতি স্যার আর. কাউচ ও জাষ্টিস লকের আদালতে বিচার হইয়া গ্রেপ্তারী পরওয়ানা স্থগিত রাখিতে ও ঢাকা আদালতের নথিপত্র তলব করিতে হুকুম প্রদান করা হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি, জাষ্টিস জ্যাকসন ও অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এজলাসে মোকর্দ্দমার শুনানী হয়।

এই মোকর্দ্দমার মনোমোহন ঘোষ যোগ্যতার সহিত বরদানাথের পক্ষ সমর্থন করেন। বিচারকগণ, আসামীদের এই কার্য্য সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে ও আত্মীয়া বিধুমুখীর হিতার্থে কৃত বুঝিয়া, তাঁহাদের বেকসুর খালাস দিলেন এবং এই যুবকদলের সৎসাহসের প্রশংসা করিলেন। মিস কলেট কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'ব্রাহ্ম ইয়ার বুক' এর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের বর্ষপঞ্জীতে এই মামলার বিবরণ আছে।

উত্তরকালে ভারত সরকারের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি কণ্ট্রোলার অফ্ পেপার ক্যারেন্সি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন কৃতী ছাত্র রজনীনাথ রায়ের সহিত এই বিধুমুখীর বিবাহ হয়।

হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়

বিক্রমপুরের যুবকদলের অন্যতম নেতা নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঢাকা নগরী হইতে 'মহাপাপ বাল্যবিবাহ' নামে এক পত্রিকা বাহির করিয়া আন্দোলন চালাইতে থাকেন ও যুবকদলের সহায়তায় অনেক কুলকন্যাকে উদ্ধার করিয়া কলিকাতায় দুর্গামোহন দাসের আশ্রয়ে পাঠাইতে লাগিলেন। ইহাদের শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থার জন্য প্রগতিবাদী দল চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কেশবচন্দ্র পরিচালিত নারীশিক্ষালয়ের শিক্ষায় ইঁহারা সন্তুষ্ট ছিলেন না, কারণ কেশবচন্দ্র নারীগণের অঙ্ক ও বিজ্ঞান শিক্ষা পছন্দ করিতেন না। দ্বারকানাথ নারীর উচ্চশিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। দুর্গামোহনের বাটিতে আশ্রয় প্রাপ্ত এই সমস্ত বালিকাদের ও দুর্গামোহনের কন্যা সরলা (পরে আচার্য্য পি, কে, রায়ের পত্নী) ও অবলার (পরে স্যর জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী লেডী অবলা বসু) সুশিক্ষার জন্য একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রগতিবাদী দল চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। দুর্গামোহন ও দ্বারকানাথের বিত্তশালী বন্ধু ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের অর্থানুকুল্যে বালিগঞ্জে এই সমস্ত বালিকাদের জন্য 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' নামে একটি স্কুল ইঁহারা স্থাপন করিলেন। সেই সময়ে মনোমোহনের গৃহে মিস অ্যাকরয়েড (পরে ঐতিহাসিক বেভারিজের পত্নী) নাম্নী একটি শিক্ষাব্রতী মহিলা বাস করিতেছিলেন। মিস অ্যাকরয়েড, বিচারপতি ফিয়ারের পত্নী ও দ্বারকানাথ স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের রিপোর্টে এই স্কুলের স্থাপয়িতা বলিয়া মিসেস ফিয়ারকে বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু উহা ভুল।

এই স্কুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক দুর্গামোহনের ভ্রাতা ভুবনমোহন (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতা) তৎসম্পাদিত 'ব্রাহ্মপাব্লিক ওপিনিয়ন' পত্রিকায় বলিয়াছেন যে এই সংবাদ ভুল, মিসেস ফিয়ার একজন শিক্ষয়িত্রী মাত্র ছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার "History of The Bramho Samaj"-এ ও 'আত্মচরিতে' ও দ্বারকানাথ স্কুলের প্রধান উদ্যোক্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্কুলের সঙ্গে ইঁহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, সেজন্য ইঁহাদের বিবরণই যথার্থ বলিয়া মনে করা সঙ্গত।

বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়

আড়াই বৎসরকাল পরে অ্যাকরয়েডের বিবাহের জন্য, ১২৮৩ সালের চৈত্র মাসে, হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় উঠিয়া যায় ও ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে, দ্বারকানাথ 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। দুর্গামোহন দাসের পত্নী ব্রহ্মময়ী স্কুলে মাসিক এক শত টাকা প্রদান করিতেন।

স্কুলের প্রধান ছাত্রীবৃন্দের মধ্যে ছিলেন: স্বর্ণপ্রভা বসু (আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের ভগিনী ও আনন্দমোহন বসুর পত্নী) সরলা দাস, (দুর্গামোহন দাসের কন্যা ও ডাক্তার পি কে রায়ের পত্নী), হরসুন্দরী দত্ত, স্বর্ণময়ী দত্ত, স্বর্ণময়ী চ্যাটার্জ্জি (পরে পার্ব্বতীনাথ দাসগুপ্তের পত্নী), বিনোদমণি বসু (মনোমোহন ঘোষের ভাগিনেয়ী), কাদম্বিনী বসু (মনোমোহন ঘোষের মাতুল ব্রজকিশোর বসুর কন্যা ও দ্বারকানাথের পত্নী), গিরিজা কুমারী সেন (শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী) ও অবলা দাস (দুর্গামোহন দাসের কন্যা ও জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী)।

ছাত্রীগণ যাহাতে গৃহকর্ম্মেও নিপুণা হন সেজন্য বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের নিয়ম ছিল যে প্রত্যেক ছাত্রীকেই পালা করিয়া রন্ধন করিতে হইবে।

সেলাই শিক্ষাও বাধ্যতামূলক ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার আত্মচরিতে এই স্কুল সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে—

"দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর দল ভারত আশ্রমের মহিলা বিদ্যালয়ে সন্তুষ্ট না হইয়া মহিলাদের উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে আর একটি স্কুল স্থাপনে অগ্রসর হইলেন। বালীগঞ্জে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া স্কুল খোলা হইল। গাঙ্গুলী ভায়া নিজে একজন শিক্ষক হইলেন। শিক্ষক কেন দিবারাত্র বিশ্রাম না জানিয়া এই স্কুলের উন্নতি সাধনের জন্য দেহ মন নিয়োগ করিলেন।"

বালিকাদিগকে অঙ্ক, ভূগোল, স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রভৃতি শিখাইবার উপযুক্ত ভাল বাঙ্গালা বই না থাকায়, দ্বারকানাথ নিজেই এই সমস্ত বিষয়ে পুস্তক রচনা করিলেন ও জাতীয়ভাবে ছাত্রীদিগকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য জাতীয় ভাবোদ্দীপক সঙ্গীতগুলির এক সংগ্রহ পুস্তক "জাতীয় সঙ্গীত" নামে প্রকাশ করিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় জাতীয় সঙ্গীতের ইহাই প্রথম পুস্তক। ১২৮৩ সালের ৬ই ফাল্গুন (ইং ফেব্রুয়ারী ১৮৭৬) ইহা প্রকাশিত হয়।

দ্বারকানাথের অক্লান্ত চেষ্টায় সরলা ও কাদম্বিনী এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার মত যোগ্যতা অর্জ্জন করিলেন। তাঁহারা যাহাতে ঐ পরীক্ষা দিতে পারেন দ্বারকানাথ সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু তখন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারও মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত হয় নাই, কাজে কাজেই এখানেও বাধা উপস্থিত হইতে লাগিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার উন্মোচনে চন্দ্রমুখীর প্রচেষ্টা

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (বর্ত্তমান যুক্ত প্রদেশের) ভুবনমোহন বসু নামক একজন বাঙ্গালী খৃষ্টিয়ানের কন্যা চন্দ্রমুখী, দেরাদুনস্থ 'ডেরা স্কুল ফর নেটিভ ক্রীশ্চান গার্লস' নামক মিশনারী স্কুলে, এণ্ট্রান্সের পাঠ্য পুস্তক ভাল

করিয়া অধিগত করিয়াছিলেন। তিনি পরীক্ষা দিবার প্রার্থনা করিলে, স্কুলের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড মিষ্টার হেরন তাঁহাকে ওয়েবষ্টারের ডিকশনারী প্রভৃতি কয়েকটী পুস্তক উপহার দিয়া তাহাকে পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিবার প্রয়াস পান ; চন্দ্রমুখীকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে না পারাতে, চন্দ্রমুখীর পক্ষ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট উক্ত পরীক্ষা দিবার অনুমতি দাবী করিতে হেরন সাহেব বাধ্য হইলেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর তারিখে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভার যে বৈঠক হয় তাহার মিনিটে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সিদ্ধান্ত হয় তাহা বিবৃত আছে। বিবরণীতে উক্ত হইয়াছে যে,—

"TheRegistrar reported that he had received an application from the Reverend David Heron, Superintendent of Dehra Boarding School for native Christian Girls, for admission of one of his pupils to the Entrance Examination now about to be held, which according to therecieved interpretation of the regulations for that examintion, he was unable to entertain, but that, in order to avoid the disappointment which would be felt by the girl's exclusion from the examination, he has arranged for her being examined privately under the supervision of the Head Master of the Missouri School, on the understanding that she was not to be considered a registered candidate, and her name should not appear in the list of passed candidates, if she should be pronounced by the examiners to have attained the pass standard."

এই সর্ত্তে চন্দ্রমুখীকে মুসৌরী সহরে পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেওয়া হইল যে, তাঁহাকে নিয়মিত পরীক্ষার্থী বলিয়া গ্রহণ করা হইবে না এবং

পরীক্ষকগণ তাঁহার উত্তর পরীক্ষা করিয়া পাশের যোগ্য নম্বর দিলেও উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের তালিকায় তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবে না।

বিশ্ব বিদ্যালয়ের দ্বার উন্মোচন

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিদ্ধান্ত শুনিয়াও দ্বারকানাথ দমিলেন না। তিনি নারীদিগের পরীক্ষা দিবার অধিকার সম্পর্কে আন্দোলন চালাইয়া যাইতে লাগিলেন এবং এদেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের এ সম্বন্ধে যত্নবান করিবার জন্য দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা চালাইতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সে সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি ভাইস্‌চ্যান্সেলার ছিলেন তিনি নারী হিতৈষী ছিলেন—তাঁহার নাম স্যার অর্থার হবহাউস। তিনি দ্বারকানাথের প্রযত্নে এ বিষয়ে অবহিত হইলেন এবং চেষ্টা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই নির্দ্ধারণ করাইয়া লইলেন যে, সরলা এবং কাদম্বিনীর পরীক্ষা দেবার যোগ্যতা হইয়াছে কি না তাহা দেখিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একটি বিশেষ প্রারম্ভিক পরীক্ষা গৃহীত হইবে এবং সে পরীক্ষায় ইঁহারা উত্তীর্ণ হইলে, ইঁহাদের রীতিমত পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেওয়া হইবে।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এই প্রারম্ভিক পরীক্ষা গৃহীত হয়। পোপ সাহেব ইংরেজির, গ্যারেট অঙ্কের, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসের এবং পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার বাঙ্গালার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁহারা সকলেই ইঁহাদের পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার যোগ্যতা স্বীকার করিয়া রিপোর্ট দিলেন।

ইহার পর ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ২৭শে এপ্রিল তারিখে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় অনারেবল মিষ্টার মার্কবি প্রস্তাব করেন যে :

"That the female candidates be admitted to the University examination, subject to certain rules"

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক যে পরীক্ষা গৃহীত হইবে, কয়েকটি বিশেষ বিধি ব্যবস্থা করিয়া এই দুইজন নারী প্রার্থীকে তাহাতে পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়া হইল।

স্থির হইল যে পুরুষ ও নারী পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য পুস্তকে ও পরীক্ষা প্রশ্নে কোনও তারতম্য থাকিবে না; তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত মহিলা তত্ত্বাবধায়িকার তত্ত্বাবধানে মহিলা প্রার্থিগণ পরীক্ষা দিবেন। এজন্য স্বতন্ত্র পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হইবে।

বেথুন ও বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের মিলন

একটি সম্পূর্ণ বেসরকারী স্কুল নারী শিক্ষায় যে অগ্রগতি দেখাইলেন, সরকারী বেথুন স্কুলে সেরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নাই জানিয়া বেথুন কলেজ কমিটির সভাপতি বিচারপতি রিচার্ড গার্থ লজ্জা বোধ করিলেন।

মনোমহন ঘোষ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে বাঙ্গলায় স্ত্রীশিক্ষার ত্রিশ বৎসর বিষয়ে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে "বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের সহিত বেথুন স্কুলের মিলনের পূর্ব্বে বেথুন স্কুল একটি "Infant nursery school" শিশুদিগের প্রাথমিক বিদ্যালয় মাত্র ছিল। তিনি বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের সহিত বেথুন স্কুলের মিলন ঘটাইবার প্রয়াসী হইলেন। এ সম্পর্কে ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দের ডাইরেক্টর অফ পাব্লিক ইনষ্ট্রাকশনের রিপোর্টে আছে "The latter (Bungo Mohila Vidyalaya) is in every sense the most advanced school in Bengal."

গার্থ সাহেবের প্রচেষ্টা সম্পর্কে ব্রাহ্ম পাব্লিক ওপিনিয়নে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে লেখা হইয়াছে যে—"The School

attracted the notice of our excellent Chief Justice Sir Richard Garth who is the present president of the Bethune School Committee. Sir Richard himself paid a vist to the school and was highly pleased with the arrangements and the instruction imparted to the girls. The result was an offer from the Committee of Bethune School to the Committee of the Bungo Mohila Vidyalaya for the amalgamation of the two Schools, which was accepted." বেথুন স্কুলের তখন সম্পাদক ছিলেন কাদম্বিনীর পিসতুত ভাই মনোমোহন ঘোষ। তিনিও এই মিলন ঘটাইতে তৎপর হইলেন। দুইটি স্কুল মিশিয়া গেল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বেথুন কলেজের বার্ষিক রিপোর্টে লিখিত আছে যে "Nearly four years have now elapsed since this Committee thought fit to amalgamate with the Bethune School, the Bango Mahila Vidyalaya, a boarding school founded by certain native gentlemen. (Vid Indian Daily News, March 8th, 1882)

বেথুন কলেজের বর্ত্তমান উন্নতির জন্য বেথুন ও বিদ্যাসাগরের সহিত সেজন্য দ্বারকানাথ, দুর্গামোহন ও আনন্দমোহনের নাম জড়িত থাকিবে।

রক্ষণশীল মহলে আপত্তি

বেথুন স্কুলের সহিত বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের সংযোগে রক্ষণশীল হিন্দুগণ ঘোর আপত্তি তুলিলেন, কেশবচন্দ্র ও তাঁহার নর্ম্মাল স্কুলের দলও কম আপত্তি করেন নাই। ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকায় নারী শিক্ষার নূতন ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা চলিতে লাগিল।

বিরোধিদল যখন আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা উচ্চ শিক্ষাভিলাষী মহিলাদের আচার ব্যবহার পোষাকপরিচ্ছদাদি লইয়া আপত্তি তুলিতে লাগিলেন। এদেশে নারীগণের অঙ্গবাস যাহা ছিল তাহা গৃহের অভ্যন্তরে চলিতে পারিলেও বাহিরে বাবহারের উপযুক্ত ছিল না। অন্তঃপুরে যাহা চলে, উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনে স্কুলে আসিতে হইলে, বা গৃহের বাহিরে যাইতে হইলে সে পরিচ্ছদ চলিতে পারে না। সেজন্য দুর্গামোহনের পত্নী ব্রহ্মময়ী, গুরুচরণ মহালানবিশের পত্নী প্রভৃতি মেমসাহেবদিগের গাউনের উপরভাগে আঁচল জুড়িয়া একপ্রকার আধা বিলাতী, আধা দেশী পরিচ্ছেদ সৃষ্টি করেন। এই পরিচ্ছদ শালীনতা রক্ষিত হইলেও সৌন্দর্য্যবোধকে ও দেশপ্রীতিকে আঘাত করিতেছিল বলিয়া, নারীগণের ব্যবহারের উপযুক্ত পরিচ্ছদ আবিষ্কারের প্রয়োজন অনুভূত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বোম্বাই প্রবাস কালে পার্শী রমণীদের পরিচ্ছদের রকমফের ঘটাইয়া বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিতা নারীগণ যে পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন, তাহা আবিষ্কার করেন। সৌন্দর্য ও শালীনতায় এই পরিচ্ছদ সকলের গ্রহণীয় বলিয়া বর্ত্তমানে গৃহীত হইয়াছে, দেশপ্রীতিরও ইহা প্রতিবন্ধক নহে কিন্তু এই পরিচ্ছদ বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ পরিতে আরম্ভ করিলে নূতনে অনভ্যস্ত বাঙ্গালী সমাজে উহার তীব্র প্রতিবাদ উঠে। উহা সাহেবিয়ানার প্রয়াস ও অহিন্দু আচরণ বলিয়া আপত্তি উঠে এবং এরূপ বিজাতীয় মনোভাব যে স্কুলের ছাত্রীগণের আছে সেই স্কুলের সহিত বেথুন স্কুলের মিলন ঘটিলে হিন্দু মহিলার শিক্ষার অন্তরায় হইবে, ইহাই ছিল ইঁহাদের যুক্তি। ১০৮০ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর "নববিভাকর" পত্রিকায় এই তথাকথিত অহিন্দু আচরণকে তীব্র আক্রমণ করিয়া এক প্রবন্ধ বাহির হয়।

তদুত্তরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তখনকার মুখপত্র "ব্রাহ্ম পাব্লিক

ওপিনিয়ন" ২০শে ডিসেম্বর তারিখে লেখেন যে "We presume to know something about the Bethune School Girls and we unhesitatingly tell our contemporary they do not dress in European style. This Bashan (dress) is not at all Bibiana (like Enropean Ladies). No doubt, they do not remain barefooted, do not wear their saries without covering on their bodies, but are decently clad. Is this Bibiana ?"

নববিভাকর, ইণ্ডিয়ান মিরর, সুলভ সমাচার ব্যতীত নবগোপাল মিত্রের ন্যাশান্যাল পেপার ও দেশীয় খৃষ্টান সমাজের "খৃশ্চান হেরাল্ড" পত্রিকাও বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের মেয়েদের তথাকথিত বিবিয়ানা ও অহিন্দু আচারের জন্য মিলনে আপত্তি তুলিলেন ও বালিকারা মাংসাহার করে বলিয়াও আপত্তি উঠিল। এতদুত্তরে ব্রাহ্ম পাব্লিক ওপিনিয়ন লিখিলেন

"Now, it is because the ladies of the Banga Mohila Vidyalaya have adopted a dress which combines the elegance of the national dress with the decency of the European. that our contemporary (Mirror) remarked they are taught to wear European constume and adopt European habits in eating and drinking. No grosser libel can be uttered than to charge them with drinking. The food the girls take is strictly national though meat formed one of the staple articles." গার্থের প্রভাবে বিরোধিগণের আপত্তি গ্রাহ্য হইল না। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট এই স্কুল দুইটি মিশিয়া গেল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম পরীক্ষার্থিনী

কাদম্বিনী বেথুন স্কুল হইতে পরীক্ষা দিয়া এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন, সরলার ইতিমধ্যে বিবাহ হইয়া যাওয়াতে তিনি পরীক্ষায় উপস্থিত হন নাই; কিন্তু ঢাকা নগরীতে স্বামী গৃহ হইতে নারীদিগের শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করেন। প্রথম বিভাগ হইতে মাত্র এক নম্বর কম হওয়াতে কাদম্বিনী প্রথম বিভাগে স্থানলাভ করিতে পারেন নাই। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ ই মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমাবর্ত্তন সভা হয় তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার স্যার আলেকজেণ্ডার আরবুথনট সাহেব বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে :—

I must not omit to mention a circumstance which is interesting and important. I refer to the fact of the senate having passed rules for the examination of female candidates, under the operation of which one Hindu young lady, educated at the Bethune Sohool, passed the Entrance examination with great credit. The young lady, to whom I refer, Kadambini Basu, obtained very high marks in Bengali, tolerable marks in History and even in exact seience—a subject which is not usually considered to be congenial to the female intellect—she acquitted herself creditably, she only missed being placed in the first division of the passed candidates for the Entrance examination by a single mark. (Vide the minutes of the Calcutta University for the year 1878-79 pp. 110.)

বাঙ্গলার ছোটলাট বাহাদুর কাদম্বিনীকে কয়েকটি পুস্তক ও অন্য কতকগুলি উপহার প্রেরণ করিয়া সম্মানিত করেন এবং ভাওয়ালের কুমার

রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় একটি স্বর্ণ পদক ও কতগুলি পুস্তক বেথুন স্কুল কমিটির সভাপতি প্রধান বিচারপতি স্যার রিচার্ড গার্থের মারফৎ প্রেরণ করেন। এই উপহারগুলি দিবার জন্য যে বিশেষ পুরস্কার বিতরণ সভা হয় তাহাতে Sir Richard Garth বলেন :

"You have already been honoured by the commendations of the Lieutenant Govenor of Bengal and by the more substantial reward which he has conferred on you and I hope and believe that the present which you are now asked to accept at my hands from a gentleman of high rank and position of Dacca, is only an additional proof of the interest which the more enlightened of your own conutrymen are taking in your career and as shewing how much native gentlemen, although they may not belong to the same religious sect as yourself, appreciate the good sense and determined energy which have induced you to continue to improve your mind and to prosecute your studies so much longer and more sucessfully than the generality of your countrywomen." B. P. O. Sept. 4, 1876.

বেথুন কলেজ স্থাপন

পরীক্ষায় কাদম্বিনী উত্তীর্ণ হওয়াতে বেথুন স্কুলের সহিত কলেজ খুলিবার জন্য দাবী উত্থিত হইল। এদিকে চন্দ্রমুখীও কলেজে পড়িবার দাবী জানাইলেন, কেন না তিনি দুই বৎসর পূর্ব্বে যে বেসরকারী ভাবে

পরীক্ষা দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বেশ যোগ্যতাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ২৬শে এপ্রিল তারিখে চন্দ্রমুখীর দাবী সিনেট সভার অধিবেশনে নয় নম্বর বিবেচ্য বিষয়রূপে তালিকাভুক্ত হইয়া বিবেচনার্থ উপস্থিত হইলে আনন্দমোহন বসু প্রস্তাব করেন যে :

"That Chandramukhi Basu, who was declared by the Junior Board of Examiners to have attained the Entrance standard in the examination of 1876, be admitted to the F. A. examination of 1879 or any subsequent year,"

পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের সমর্থনে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

এদিকে কাদম্বিনীর সাফল্যের সংবাদে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে (বর্ত্তমান সংযুক্ত প্রদেশ) বোম্বাইয়ে ও মান্দ্রাজে, শিক্ষার্থিদের মধ্যে প্রবল উৎসাহের সঞ্চার হইল এবং সেই সব অঞ্চল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিকট নারীদিগের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবার দাবী উঠিতে লাগিল। ফলে কলিকাতার ন্যায় মান্দ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ও নারীদিগের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। সংযুক্ত প্রদেশ তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কাজে কাজেই তাহাদের জন্য দ্বার পূর্ব্বেই খুলিয়া গিয়াছিল। সেখানকার প্রার্থিরা তাই সহজেই পর বৎসর হইতে পরীক্ষা দিতে পারিলেন।

বেথুন স্কুলকে বাধ্য হইয়া কলেজে পরিণত করিতে হইল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে কটক কলেজের অধ্যাপক শশিভূষণ দত্ত এম এ মহোদয়কে কলেজের প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া ক্লাশ খোলা হয়।

তখন বেথুন স্কুল কেবল হিন্দু বালিকাদিগের জন্যই ছিল, স্কুলের কলেজ বিভাগেও সেই নিয়ম বাহাল হইল। চন্দ্রমুখী ফ্রি চার্চ্চ অফ স্কটল্যাণ্ডের

কলেজে ছাত্রী হইলেন ও কাদম্বিনী বেথুন স্কুলের প্রথম ও একমাত্র ছাত্রীরূপে কলেজ বিভাগে পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

১৮৭৯—৮০ বাঙ্গালা শিক্ষাবিভাগের রিপোর্টে আছে যে :

"The only student in this department (College) of the school was Miss Kadambini who passed the Entrance examination in December 1878."

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা সরকার মান্দ্রাজের কুমারী ডি আব্রুকে কলেজ বিভাগে পড়িতে অনুমতি দেওয়াতে কলেজের দ্বার জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে নারীগণের জন্য উন্মুক্ত হয়। এ সম্পর্কে ওই রিপোর্টে আছে যে

"In March last the Lieutenant Governor sanctioned the admission into the College class of Miss D, Abreau who passed the examination in December 1879. By the admission of Miss D' Abreau the question has been decided as to the admission into the new College class of other than Hindu girls.

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বেথুন স্কুল হইতে কাদম্বিনী ও ফ্রি চার্চ্চের কলেজ হইতে চন্দ্রমুখী এফ' এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বেথুনে বি' এ পরীক্ষায় প্রস্তুত হইবার জন্য ভর্ত্তি হইলেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ডি আব্রু এন্ট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের কন্যা কামিনী (পরে সুবিখ্যাত মহিলা কবি কামিনী রায় রূপে পরিচিত) ও সুবর্ণ প্রভা বসু এন্ট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কামিনী বেথুন কলেজে ভর্ত্তি হইলেন; সুবর্ণপ্রভার সহিত আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের ভ্রাতা ডাক্তার

মোহিনীমোহন বসুর বিবাহ হইয়া যাওয়াতে তিনি কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার অল্পদিন পরেই কলেজ ছাড়িয়া দিলেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখী বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট হইলেন। তখনও ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দ্বার মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত হয় নাই।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে দুর্গামোহন দাসের কন্যা অবলা দাস (পরে জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্ম্মিণী) ও ডাক্তার অন্নদা চরণ খাস্তগিরির কন্যা কুমুদিনী (পরে নগেন্দ্রনাথ দাসের সহধর্ম্মিণী ও বেথুন কলেজের লেডি প্রিন্সিপ্যাল) বেথুন স্কুল হইতে, ভার্জ্জিনিয়া মেরী মিত্র (পরে ডাক্তার মিসেস নন্দী) কানপুর বালিকা বিদ্যালয় হইতে, নির্ম্মলা মুখোপাধ্যায় (পরে নির্ম্মলা সোম) ফ্রি চার্চ্চ স্কুল হইতে, প্রিয়তমা দত্ত (পরে চ্যাটার্জ্জি) আপার খৃশ্চান স্কুল হইতে ও বিধুমুখী বসু (পরে ডাক্তার মিস বসু) ডেরা স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। নারীর উচ্চ শিক্ষার দ্বার এরূপে ক্রমশঃ খুলিয়া গেল।

অন্তপুরে স্ত্রীশিক্ষা ব্যবস্থা

স্কুল কলেজের পাঠের ব্যবস্থার জন্য দ্বারকানাথ যখন লিপ্ত ছিলেন, দেশের তখনকার সামাজিক অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া পুরনারীদের তিনি সে সময় বিস্মৃত হন নাই।

তত্ত্ববোধিনীর দল, যেমন বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম ও ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তনের জন্য দেশের শহরে শহরে পল্লীতে পল্লীতে "সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী" "নিত্যজ্ঞান প্রদায়িনী" প্রভৃতি সভা স্থাপন করিতেছিলেন, তেমনি লোক ও সমাজ হিতকর কার্য্য প্রবর্ত্তনের জন্য, 'হিতকরী সভা' 'শুভসাধিনী সভা'

প্রভৃতি নামে সভা প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয় স্থাপন, সুরাপাননিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তন প্রভৃতি কাজ আরম্ভ করিয়া দেন।

প্রথম অন্তঃপুর শিক্ষাকেন্দ্র

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত 'উত্তরপাড়া হিতকারী সভা' এইরূপ সভার আদি। এই সভার নানা হিতকরী উদ্দেশ্যের মধ্যে "to support the poor widows and orphans, ও to encourage female education" অন্যতম। সভার প্রথম দিকের রিপোর্টেই দেখা যায় যে—

"The sabha extends its examination to the zenana and there is growing disposition to profit by the advantages thus offered."

হিতকারী সভার এই আন্দোলন প্রধানতঃ পশ্চিম বঙ্গের দুই চারিটি স্থানেই প্রসার লাভ করে।

বরিশালে নারী আন্দোলন

নারী আন্দোলন পূর্ব্ব বাঙ্গালাতে বরিশালে সর্ব্বাধিক গতিশীল ছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে সেখানে বয়স্কা মহিলাদের জন্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এ সময় ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের জামাতা তারা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের কাজে যোগ দিয়া উৎসাহের সহিত সমাজ সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন। ১৮৬১ হইতে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বরিশালে নয়টি বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হয়, তন্মধ্যে তিনটি সবর্ণ ও ছয়টি অসবর্ণ বিবাহ।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বরিশালের মহিলাগণ প্রকাশ্যভাবে মন্দিরের উপাসনায় যোগ দিতে আরম্ভ করেন ও ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের মাঘোৎসবের সময় শ্রীমতী

মনোরমা মজুমদার সমাজের আচার্য্যরূপে উপাসনা করেন ও একটি হৃদয়গ্রাহী উপদেশ প্রদান করেন।

এ সম্পর্কে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ২৫শে জুলাই ব্রাহ্মপাব্লিক ওপিনিয়ন পত্রিকায় বলা হইতেছে যে—

"This lady inaugurated a new era in the history of the Brahmo Samaj. This was the first instance of a Brahmica lady conducting divine service and delivering sermons in the public.." ইতিপূর্ব্বে শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চ্যাটার্জ্জি বগুড়া পারিবারিক ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্যের কাজ করেন সত্য, কিন্তু বরিশালের মত শহরে মাঘোৎসবের মত উৎসবে এতবড় দায়িত্বপূর্ণ পদে একজন মহিলার অধিষ্ঠান হেতু এই ব্যাপারকে a new era বলিয়া ব্রাহ্মগণ তখনই স্বীকার করেন। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় পরবৎসর ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বগুড়া ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্যের কাজ করেন। এইভাবে ধর্ম্মসমাজেও মহিলার অধিকার এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সম্মিলনী সভা আন্দোলন

দ্বারকানাথ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া যখন পূর্ব্ববঙ্গের প্রগতিশীল যুবকদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন তখন তিনি স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের জন্য পূর্ব্ববঙ্গের যুবকদিগকে প্রোৎসাহিত করিতে থাকেন। মুসলমান পাড়া লেনস্থ মেসের পূর্ব্ব বাঙ্গলার ছাত্রদিগের সহযোগে সম্মিলনী সভা প্রতিষ্ঠিত করেন: এরূপে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ঢাকা শুভসাধিনী সভা, ঢাকায় নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রবর্ত্তিত অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা, জগবন্ধু লাহার সম্পাদকতায় বরিশাল অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। কলিকাতাই তখন যুব আন্দোলনের কেন্দ্র এবং সকল সৎকার্য্যে যে অর্থের প্রয়োজন

হয় তাহা সংগ্রহের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্র জানিয়া কলিকাতাস্থ পূর্ব্ব বঙ্গীয় যুবকদিককে লইয়া সম্মিলনী সভা সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিতে দ্বারকানাথ চেষ্টা পাইতে থাকেন এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বিক্রমপুর সম্মিলনী স্থাপন করিতে সমর্থ হন। এই সমিতির উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রধান ছিল 'to extend the advantages to the female population of the pargana, to found schools in villages where none exist, to strive also to improve the education of adult in their homes.'

দ্বারকানাথের চেষ্টায় বিক্রমপুর সম্মিলনীর ন্যায় ফরিদপুর সুহৃদ সভা, বাখরগঞ্জ হিতকারী সভা, যশোহর ইউনিয়ন, সিলেট ইউনিয়ন প্রভৃতি সভাও ওই সমস্ত স্থানের কলিকাতা প্রবাসী যুবকগণের চেষ্টায় স্থাপিত হইল।

গৃহে বসিয়া নির্ব্বাচিত বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তকের পরীক্ষা দিয়া পুরস্কার লাভে পুর মহিলারা পাঠাভ্যাসে বহুস্থানে উৎসাহিত হইয়া উঠেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এই সম্মিলনীগুলির পক্ষ হইতে এজুকেশন কমিটির নিকট যে মেমোরিয়াল প্রেরিত হয় তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সম্মিলনীগুলিতে পরীক্ষা দিতে সর্ব্বসমেত ৫৫০জন মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। মেমোরিয়ালে আছে "More than 550 girls and adult ladies were examined last year by these Associations."

দ্বারকানাথের মনে নারী জাতির শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে যে ধারণা ছিল তাহা বিক্রমপুর সম্মিলনীর প্রথন বার্ষিক রিপোর্টে স্পষ্ট বিবৃত আছে। রিপোর্টে নারীদের শিক্ষা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে "যে প্রণালীতে ইতিহাস লিখিত হইয়া থাকে, তাহা পাঠ করিয়া কুল কন্যাদিগের কোন উপকারের সম্ভাবনা আছে, এমত বোধ হয় না। তবে যদি প্রকৃত রাজনৈতিক ও জাতীয়

উন্নতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়, প্রাপ্তবয়স্কা শিক্ষিতা কুলকন্যাগণ তাহা পাঠ করিতে পারেন। ভূগোলের স্থূল জ্ঞান থাকা উচিত বটে, কিন্তু যাঁহারা নিজ দেহের রক্তবাহী শিরা সকল অবগত নহেন, তাঁহাদিগকে সাইবিরিয়ার বিজন প্রান্তরবাহী নদী সমূহের নামমালা কণ্ঠস্থ করাইয়া কি ফল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন দেশের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভৌগোলিক বিবরণ কণ্ঠস্থ করা অপেক্ষা দেহতত্ত্বের কিঞ্চিৎ বিবরণ পরিজ্ঞাত হইলে যে অধিক উপকারের সম্ভাবনা আছে, তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। তত্রাচ ইহা বলা আবশ্যক যে ভৌগোলিক বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিষয় সকলের সহিত যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়া মুদ্রিত হইলে তাহা অবশ্য পাঠ করা যাইতে পারে।"

(বিক্রমপুর সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক রিপোর্ট ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সুধাকর প্রেস হইতে মুদ্রিত।)

বাঙ্গলার বাহিরে নারীর উচ্চশিক্ষা

বাঙ্গলার বহু চেষ্টায় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় নারীদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেওয়া হইলেও মান্দ্রাজ বা বোম্বাইতে সে অধিকার দেওয়া হয় নাই। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার হইতে যে এডুকেশন কমিশন নিযুক্ত হয় তাহার সিদ্ধান্ত নারীর উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে এরূপ— "That an alternative examination in subjects suitable for girls be established corresponding in standard to the Matriculation examination but having no relation to any existing University course."

অর্থাৎ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেরাডুনের রেভারেণ্ড হেরনের আবেদনে চন্দ্রমুখী বসুকে যেভাবে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইয়াছিল কিম্বা ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে সরলা দাস ও কাদম্বিনী বসুকে যে প্রারম্ভিক পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, ভারতে সর্ব্বত্র সেই টুকু অধিকার মাত্র বিস্তার করাই এই কমিশনের অভিমত।

কিন্তু মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এর দ্বারও বেশীদিন রুদ্ধ রাখা সম্ভব হয় নাই। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কাদম্বিনী, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ডি আব্রু, কামিনী ও সুবর্ণপ্রভা ও ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ছয়জন বঙ্গমহিলা ও দুইজন ইংরেজ মহিলা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হওয়াতে অন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার খুলিতে হইল। কিন্তু বাঙ্গলার মত নারীর উচ্চ শিক্ষা তেমন বিস্তার বহুদিন অন্যত্র হয় নাই। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের Director of Public Instruction ডানকাণ সাহেব রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে "Demand for upper secondary education hardly exists among Hindus and Mohamedans"

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত মান্দ্রাজে ১৮৩জন মহিলা মাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তন্মধ্যে ১৫০জন ইউরোপিয়ান ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, ২৭ জন নেটিভ খৃষ্টান, একজন ব্রাহ্মণ, একজন মুসলমান ও চারিজন পার্শী।

বঙ্গ মহিলা সমাজ

কলিকাতায় কেশব বাবু মহিলাদের জন্য যে সভা করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা আরও উন্নততর মহিলা সভা গঠনের জন্যও দ্বারকানাথ তাঁহার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুদিগের সহিত চেষ্টা পাইতে থাকেন ও ফলে ৮ই আগষ্ট ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে আনন্দমোহন বসুর বাটিতে রামতনু লাহিড়ীর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা হয় ও তাহাতে যে উৎসাহ জাগে

তাহার ফলস্বরূপ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ মহিলা সমাজ বা বেঙ্গল লেডিজ অ্যাসোসিয়েশন নামক নারী সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন স্বর্ণপ্রভা বসু (আনন্দমোহন বসুর পত্নী) ও সম্পাদিকা হন কাদম্বিনী বসু।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে একটি রিপোর্টে দেখা যাইতেছে যে, সভার সদস্যগণ অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে "reads and discusses news from England and America" অর্থাৎ ইংলণ্ড ও আমেরিকার ঘটনা সমূহের সংবাদ পাঠ ও তৎসম্পর্কে আলোচনা সভার কার্য্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত নিয়মিত বিষয়রূপে গণ্য ছিল। সে বৎসর যে সমস্ত সংবাদ লইয়া আলোচনা চলিয়াছিল: তাহার বিবরণ এই—

Among the news read were (1) The death of President Garfield (2) Multan riots (3) Church, Social Science, Oriental, Geographical and Ecclesiastical Congresses (4) Hollways College for women costing the donor 25 lakhs for the buildings ; the special feature in the college being the appointment of women Governors of the institution (5) Local Government Scheme (6) Durbar of Mysore Ryots (7) The Crisis in Egypt.

(Vide the Journal of the National Indian Association, June. 1882 pp 60)

ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন

এদেশে নারীজাতির শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করিবার ও সকল প্রকার নারী মঙ্গল কর্ম্মে উৎসাহ দিবার উদ্দেশ্য লইয়া, ভারতবন্ধু মিস মেরী

কার্পেণ্টার যে ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করেন, দ্বারকানাথ কলিকাতায় আসার পর হইতেই সেই সমিতির কার্য্যে উৎসাহের সহিত সহায়তা করিতে থাকেন এবং নারী পাঠ্য উপন্যাস 'সুরুচির কুটির' রচনা করিয়া এই সমিতির মেরী কার্পেণ্টার প্রাইজ লাভ করেন।

এই সমিতির কলিকাতা শাখায় মনোমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রীর সহিত কার্য্যকরী সমিতির সদস্যরূপে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও বেশ উৎসাহের সহিত কাজ করিতে দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রও যে নারীর উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, এই সভাতে যোগ দেওয়াতে তাহা প্রমাণিত হয়।

প্রথম আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ৭ই জুলাই লাহোর নগরীতে প্রথম আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ নিষ্পন্ন হয়। পাত্র মধুসূদন সরকার নামক একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্ম যুবক ও পাত্রী ক্ষেত্রী সম্প্রদায়ভুক্ত পাঞ্জাবী হিন্দু লালা শিব প্রসাদের কন্যা বিম্ববাদেবী।

(Vide Miss Collet's Brahmo year Book 1870 Page 54, and 14th Annual Report of the Punjab Brahmo Samaj which says "As the occurence was the first of its kind in this part of the country, it was thought proper to celebrate it at Lahore in one of its thickly populated Mohalla. This was the third marriage according to the Brahmo rites".)

পণ্ডিতা রমাবাই ও বোম্বাইয়ে নারী আন্দোলন

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিতা রমাবাইর নারীমঙ্গল কার্য্য আরম্ভ হয় এবং প্রথম হইতেই তিনি দ্বারকানাথের সহায়তা লাভ করেন। পণ্ডিতা রমা-

বাই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মঙ্গালোর জিলায় গুণগামল নামক অরণ্য সঙ্কুল স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে পিতার নিকট হইতে মারহাট্টি ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা লাভ করেন, পরে নিজের চেষ্টায় কর্ণাটকি বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানী ভাষাতে বুৎপন্ন হন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে পিতৃ মাতৃহীন হওয়াতে একমাত্র ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া তিনি অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারত ভ্রমণে বাহির হন। পাঞ্জাব, রাজপুতনা, মধ্যপ্রদেশ, আসাম প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া শেষে তিনি বাঙ্গলায় আসেন। প্রত্যেক স্থানের বড় বড় শহরে তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহার পর তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যু ঘটিলে যখন তিনি বিশ্বে একাকিনী তখন শ্রীহট্টবাসী এক তরুণ বাঙ্গালী উকিলের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং রমাবাই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ষোল মাস বিবাহিত জীবন-যাপনের পর রমাবাই বিধবা হন।

(Vide Dwarika Nath Ganguli's article in the National Indian Association Magazine 1882 and Pandita Ramabai's own introduction in the "High caste Hindu women.")

কলিকাতায় অবস্থানকালে দ্বারকানাথ ও শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নারীমঙ্গল কার্য্যের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে এবং সেই ধারা অনুকরণে বোম্বাই অঞ্চলে কাজ করিবার বাসনা তাঁহার মনে জাগ্রত হয়। তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দেই পুণা শহরে গমন করিয়া মহাত্মা মহাদেব গোবিন্দ রানাডের পত্নী রমাবাই রানাডে, শ্রীমতী তনুবাই তারখুদ ও শ্রীমতী ধারুবাই লিমে প্রভৃতি নারীরত্নের সহিত মিলিত হইয়া আর্য্য মহিলা সমিতি বলিয়া একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।

আর্য্য মহিলা সমিতি

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ৩১শে মে এই সভার প্রাথমিক অধিবেশন হয়। এই সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে—(ক) নারীদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার (খ) বাল্য বিবাহ প্রভৃতি অনিষ্টকর কুপ্রথা নিবারণ ও (গ) নারী সমাজের সামাজিক, নৈতিক ও ধর্ম্মজীবনের উন্নতিমূলক কার্য্য সাধন প্রধান ছিল। পুণার এই সমিতিকে সাহায্য করিবার জন্য দ্বারকানাথ একটি আবেদন প্রকাশ করেন, তাহাতে পণ্ডিতা রমাবাইএর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া দ্বারকানাথ বলেন যে "such is the career of a lady who is doing so much for the unfortunate women of India. But she can hardly achieve any success single handed It is incumbent on men to set aside their apathy towards females, to give them the concessions they have a right to claim, and to support them in their efforts towards progress. If they do not give a helping hand to the so called feeble sex, time will come when the members of that sex will form themselves into a strong community and challenge them to open war. It is hoped that our enlightened brethren in different parts of India will lend their aid towards the establishment of branch Associations and induce their female relations to join this Society. The National India Association, it is also hoped will give its cordial support to this movement"

নারীর রাষ্ট্রিক অধিকারে দ্বারকানাথ

নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জ্জনেও দ্বারকানাথের উৎসাহ বড় কম ছিল না। জাতীয় মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই দ্বারকানাথ নারীগণের ডেলিগেট হইবার দাবী লইয়া আন্দোলন উপস্থিত করেন ও পঞ্চম অধিবেশন হইবার পূর্ব্বেই কংগ্রেস সেই দাবী পূরণ করাতে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের যে পঞ্চম অধিবেশন হয় তাহাতে ছয়জন মহিলা ডেলিগেটরূপে উপস্থিত হন—তন্মধ্যে দ্বারকানাথের পত্নী কাদম্বিনী অন্যতম ছিলেন এবং মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের পত্নী রমাবাই রাণাডে ও আহ্মাদাবাদের বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক মহীপৎরাম রূপরাম নীলকণ্ঠের পত্নীও ডেলিগেটরূপে সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই কংগ্রেসে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা সুপ্রসিদ্ধা মহিলা লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী ঘোষালও ডেলিগেটের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন। পরের বৎসর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস নারীদিগের প্রস্তাব উত্থাপন ও আলোচনা করিবার অধিকার স্বীকার করেন ও কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে (কলিকাতায়) এই স্বীকৃতির প্রতীক হিসাবে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দানের ভার অর্পিত হয়। এই ঘটনা নারী আন্দোলন ইতিহাসের একটি নব পর্ব্বের আরম্ভ, তাই অ্যানিবেসাণ্ট মহাশয়া এই ক্ষুদ্র ও আপাতদৃষ্টিতে নগণ্য ঘটনাব উল্লেখ করিয়া তাঁহার "How India wrought for her freedom" গ্রন্থে বলিয়াছেন—one of the delegates Mrs. Kadambini Gangulv was called on to move the vote of thanks to the chairman, the first woman who spoke from the Congress platform, a symbol that India's freedom would uplift India's Womanhood."

এখানে মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, জাতীয় মহাসভা নারীর এই মর্য্যাদা ইংলণ্ডের বহুপূর্ব্বেই স্বীকার করিয়া জগতে নারীর রাষ্ট্রিক অধিকার স্বীকৃতিতে এক গৌরবময় স্থান অর্জ্জন করিলেন। সুসভ্য (!) ইংলণ্ডে নারীর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার ও নারীর রাষ্ট্রিক অধিকার স্বীকারের বহুপূর্ব্বেই দ্বারকানাথের চেষ্টায় তাহা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

চিকিৎসা জগতে নারী

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কাদম্বিনী এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর নারীজাতির সুচিকিৎসা নারী চিকিৎসক দ্বারাই হওয়া প্রয়োজন মনে করিয়া মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইবার চেষ্টা পান, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ অনুমতি প্রদান করিলেন না। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পর দ্বারকানাথ তাঁহাকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য দাবী করিতে বলেন। তখন যে কোন ছাত্র বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে চাহিলে বিনা বেতনে মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইতে পারিতেন। নিয়ম ছিল যে কেহ (any person) বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বিনা বেতনে মেডিক্যাল কলেজে পড়িতে পারিবেন। এই any person স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই বুঝায়; নিয়ম প্রস্তুতের সময় কোন মহিলার গ্র্যাজুয়েট হইবার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু কাদম্বিনী গ্র্যাজুয়েট হইবার সময়ও ঐ নিয়ম অপরিবর্ত্তিত থাকায় এই নিয়মের সুযোগ চাহিতে কর্ত্তৃপক্ষ নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে পড়িতে দিতে বাধ্য হইলেন।

ইহার পরই কাদম্বিনীর সহিত দ্বারকানাথের বিবাহ হইয়া যায়। দ্বারকানাথের বন্ধুগণও মনে করিলেন যে বিবাহান্তে দ্বারকানাথ মেডিক্যাল কলেজে স্ত্রীকে পড়িতে দিবেন না। কিন্তু দ্বারকানাথ কর্ত্তব্য পথ হইতে

চ্যুত হইবার লোক ছিলেন না। কাদম্বিনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠ রীতিমত শেষ করিয়া শেষ পরীক্ষায় উপস্থিত হইলেন। তিনি মেডিক্যাল কলেজে পাঠ্য বিষয়ের প্রশ্নপত্রের যথাযথ উত্তর দিয়া পাশ নম্বর পাইলেন, কিন্তু মেডিক্যাল কলেজে সে সময়ে এক বাঙ্গালী অধ্যাপক ছিলেন। তিনি নারীশিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। অধীত বিষয়ের কার্য্যকরী জ্ঞানের পরীক্ষার (practical examination) সময় তিনি একটি বিষয়ে প্রয়োজনীয় নম্বর দিলেন না। মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ বেশ জানিতেন যে ওই বিষয়ে কাদম্বিনীর বেশ দক্ষতা আছে, কিন্তু পরীক্ষকের অভিমতের বিরুদ্ধে কিছু করিবার ক্ষমতা না থাকায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. বি উপাধি এক্ষেত্রে প্রদান করিতে পারিলেন না; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হইবার পূর্ব্বে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদিগকে গ্র্যাজুয়েট অফ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ (জি, বি, এম, সি) উপাধি অধ্যক্ষই দিতেন, সে অধিকার বন্ধ করিয়া কোনও আইননামা হয় নাই। সে জন্য যদিও বহু দিন ওই উপাধি কাহাকেও দেওয়া হয় নাই, তবুও এ ক্ষেত্রে তিনি কাদম্বিনীকে উহা প্রদান করিয়া তাঁহাকে চিকিৎসা করিবার অধিকার দিলেন ও মহিলাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ইডেন হাঁসপাতালের চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন।

কিন্তু দ্বারকানাথ এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না হইতে পারিয়া কাদম্বিনীকে ইংলণ্ডে চিকিৎসাবিদ্যা শিখিতে প্রেরণ করিলেন। কাদম্বিনী এডিনবরা ও গ্লাসগো হইতে এল, আর, সি, পি, ও এল, আর, সি, এস ও এল, এফ, পি, এস উপাধি লইয়া ফিরিলেন।

আনন্দি বাই যোশী

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বোম্বাই শহর হইতে গণপৎ রাও বিনায়ক যোশীর পত্নী আনন্দি বাই যোশী আমেরিকার পেনসিলভিনিয়া নারী চিকিৎসা

কলেজে পড়িবার জন্য রওনা হন ও ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ ওই বিদ্যালয় হইতে এম, ডি উপাধি লাভ করেন। তিনি ভারতের সর্ব্বপ্রথম মহিলা এম, ডি। আনন্দি বাই যোশী বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের সদস্য ছিলেন।

"সঞ্জীবনী" পত্রিকা স্থাপন

দ্বারকানাথ তাঁহার কর্ম্ম সহচরগণের মধ্যে কালীশঙ্কর সুকুল, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয়ের সহযোগিতায় যে "সঞ্জীবনী" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করেন, তাহার মূলেও নারী হিতৈষণার প্রেরণা বর্ত্তমান ছিল। যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু যখন সুলভ সাপ্তাহিক পত্র প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়া "বঙ্গবাসী" পত্রিকা বাহির করেন, তখন ওই পত্রিকা পরিচালনে তিনি দ্বারকানাথ, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি সংস্কারপন্থীদের সহায়তায় উহা প্রকাশ করেন। 'বঙ্গবাসী' অতি অল্পদিনেই জনপ্রিয় হইয়া উঠে। তখন উহাকে আরও শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে যোগীন্দ্র বাবু, চন্দ্রনাথ বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াপন্থী লেখকদিগের রচনা বাহির করিতে আরম্ভ করেন। ইন্দ্রনাথ তাঁহার লেখার মধ্য দিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভেচ্ছু মহিলাদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলে দ্বারকানাথের দল তাঁহার প্রতিবাদ করেন, কিন্তু যোগীন্দ্র বাবুর প্রতিবাদের কোনও সম্ভাবনা না দেখিতে পাইয়া তাঁহারা 'বঙ্গবাসীর' সংশ্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাহার পর নারী প্রগতি ও অন্যান্য সংস্কার মূলক কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য 'সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা'কে মূলমন্ত্র করিয়া 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা স্থাপন করিলেন।

ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়

নারী আন্দোলনে দ্বারকানাথের ইহাই শেষ কীর্ত্তি নহে। বেথুন কলেজের মূলে তাঁহার প্রচেষ্টা বড় কম ছিল না; কিন্তু কিছুদিন পরেই

তিনি বুঝিতে পারেন যে নীতি ও ধর্ম্মের সংস্পর্শ বিরহিত শুধু আক্ষরিক শিক্ষা নারীজাতির পক্ষে কল্যাণকর নহে। তদ্ব্যতীত ভবিষ্যৎ জীবনে সুগৃহিণী হইতে হইলে যে শিক্ষার প্রয়োজন স্কুলের শিক্ষার সহিত সেগুলি শিক্ষার ব্যবস্থাও নারীশিক্ষা আয়তনে থাকা উচিত। স্বাস্থ্যতত্ত্ব, রন্ধন-বিদ্যা, গার্হস্থ্য চিকিৎসা বিধান প্রভৃতি নারীবিদ্যালয়ের শিক্ষিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ে এই সমস্ত বিষয়ের কিছু কিছু শিখাইবার ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু বেথুন স্কুলে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ও শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পাঠই দেওয়া হইত, এ সমস্ত শিখাইবার কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। ব্রাহ্ম বালিকাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থার জন্য দ্বারকানাথ, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অঘোরনাথ মুখোপাধ্যা-য়ের সহিত মিলিত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পার্শ্বে যে ব্রাহ্ম পল্লী আছে সেখানে একটি স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুল ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার History of the Brahmo Samaj Vol II pp 160 এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন "It was no direct work of the Samaj Committee, but was started and maintianed principally through the exertions of Mr. D. N. Gangully of female emancipation fame and of Mr. Sasipada Bannerji, who had built a house and came to reside in the Samaj quarter."

দ্বারকানাথ ও শশিপদের এই ব্যক্তিগত চেষ্টাকে আরও দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং নারী শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে আদর্শ স্পষ্ট করিয়া তুলিতে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মাঘোৎসবের সময় একটি আলোচনা সভা আহ্বান করেন। সভা একটি কমিটি নিয়োগ করিয়া-ছিলেন। অল্প খরচে বোর্ডিংএ থাকিয়া মফঃস্বলস্থ বালিকারা যাহাতে

সুশিক্ষা লাভ করিতে পারে সেজন্য একটি স্কুল স্থাপনের জন্য কমিটি চাঁদা তুলিতে আরম্ভ করেন ও অল্প সময়ে বাইশ শত টাকা চাঁদা উঠে। এই ভাবে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ৩রা জ্যৈষ্ঠ প্রধানতঃ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর চেষ্টায় এই স্কুল স্থাপিত হয়। প্রথমে স্কুল চতুর্থ শ্রেণী অবধি (অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের সেভেন্থ ষ্টাণ্ডার্ড) ছিল। দ্বারকানাথ স্কুলের সম্পাদক পদ গ্রহণ করিয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে উহাকে এণ্ট্রান্স ষ্টাণ্ডার্ড স্কুলে পরিণত করেন।

শিবনাথ শাস্ত্রীর নারী কল্যাণ প্রচেষ্টা

দ্বারকানাথের নারী কল্যাণ ব্রতের প্রধান সহায়ক ছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। শাস্ত্রী মহাশয়ের চেষ্টাতেই সুবিখ্যাত সাহিত্যিক পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এক বালবিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া সমাজ সংস্কারে আপনাদের অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় প্রদান করেন। বহুবাজারের সুবিখ্যাত সমাজনেতা শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাসও শাস্ত্রীমহাশয়ের সহায়তায় একজন বিধবাকে বিবাহ করেন। নারীর উচ্চ শিক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারেও শাস্ত্রী মহাশয় দ্বারকানাথকে সর্ব্বদা সাহায্য করিতেন। কিন্তু একটি ব্যাপারে শাস্ত্রী মহাশয়ই অগ্রণী হইয়া আর একটি সমাজ সংস্কার কার্য্যের পথ সুগম করিতে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেন বলিয়া নারীহিত ব্রতে একজন অগ্রণী হইয়া থাকিবেন, তাহা হইল পতিতা নারীর কন্যাদিগকে পাপের পথ হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়া সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। এই কাজ অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার পথে বহু বিঘ্ন আছে; সেজন্য উহা ব্যাপক ভাবে সম্পন্ন না হইলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে শাস্ত্রী মহাশয় এমন ভাবে এই ব্রত পালনে সমর্থ হইয়াছেন যে সেই সমস্ত কন্যা ভবিষ্যৎ কালে সুগৃহিণী হইয়া এমন সমস্ত সন্তান সন্ততির মাতা হইয়াছেন,

যাঁহারা সমাজে রত্ন স্থানীয় হইয়া সমাজে এমন স্থান লাভ করিয়াছেন যে তাঁহাদের বংশের পূর্ব্ব কালিমা আজ আর কেহ স্মরণ পর্য্যন্ত করে না।

শাস্ত্রী মহাশয় এক পতিতা নারীর লক্ষ্মীমণি নাম্নী কন্যার উদ্ধারকাহিনী তাঁহার আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। *

গগন চন্দ্র হোম মহাশয়ও এইরূপ আর একটি নারীর উদ্ধার কাহিনী তাঁহার "জীবনস্মৃতি'র ১০-১৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই পতিতা নারীর কন্যাটির পরে একটি সচ্চরিত্র ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম যুবকের সহিত বিবাহ হয় এবং চারিত্রিক মহিমায় এই নারীটি এমনই সুনাম অর্জ্জন করেন যে এক অতি প্রসিদ্ধ সাধু পরিবারের একটি যুবক চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর সহিত ইহার কন্যার বিবাহ হয় এবং পুত্র সুশিক্ষা লাভ করিয়া সরকারী বিচার বিভাগে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হইয়া বেশ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। গগনবাবু লিখিয়াছেন যে "পুত্রটি তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা ও সাধু চরিত্রের বলে ব্রাহ্ম সমাজের গৌরব স্থানীয় হইয়াছেন, রাজকার্য্যোপলক্ষ্যে যেখানে যান, সেইখানেই লোকে তাঁহার গুণে মুগ্ধ হয়। ব্রাহ্ম সমাজের এক সুশিক্ষিত লোকের সুশিক্ষিতা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজেরই মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইয়াছে।"

শাস্ত্রী মহাশয়ের চেষ্টায় একজন প্রসিদ্ধা অভিনেত্রীর কন্যাও ব্রাহ্ম সমাজে অল্প বয়স হইতেই আশ্রয় লাভ করিয়া সুশিক্ষার গুণে সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয়া হইয়াছিলেন। একজন সাধু চরিত্র মহাপ্রাণ যুবকের সহিত উত্তরকালে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার এক কন্যা একটি প্রসিদ্ধ বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা হইয়াছিলেন এবং আপনার মিষ্ট স্বভাব

* শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত ২০৫-০৬ পৃ।

ও ধর্ম্মপ্রাণতার জন্য সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারিয়াছিলেন। মহিলাটির একটি পুত্র অতি যশস্বী চিকিৎসক হইয়া সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সমাজ তাঁহাদের পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হইয়াছে, সেজন্য নাম প্রকাশ বিধেয় নহে। তবে এ সমস্ত কাহিনী সমাজের প্রধানগণ অবগত আছেন।

নারীমঙ্গল যজ্ঞে শশিপদ ও মহেশচন্দ্র

এ যুগের আরও যে দুইজন কর্ম্মীর সম্বন্ধে কিছু না বলিলে কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়—তাহারা হইলেন সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র আতর্থী।

শশিপদ বাবুর কর্ম্মবহুল জীবন প্রধানতঃ শ্রমিক কল্যাণ কার্য্যে ও ধর্ম্ম সমন্বয় ব্যাপারে নিয়োজিত থাকিলেও নারীকল্যাণ ব্রতেও তাঁহার দান সামান্য নহে। শশিপদ বাবু যৌবনেই আপন পত্নী ও পরিবারের অন্যান্য মহিলাদিগের শিক্ষা দিবার মানসে, আপনার বাস গৃহে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে, একটি পারিবারিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে যত্নবান হন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে, সূতিকাগৃহেই শশিবাবুর প্রথম পুত্রের মৃত্যু হওয়াতে, তিনি অস্বাস্থ্যকর সূতিকাগৃহ ও শিশুপালন বিদ্যায় অজ্ঞতা প্রযুক্ত যে বহু শিশু এদেশে অকালে প্রাণ হারাইতে বাধ্য হয় তাহা অবগত হন এবং আপন গ্রাম বরাহনগরে সূতিকাগৃহের সংস্কর সাধনের জন্য জোর প্রচার চালাইতে থাকেন। নারীশিক্ষা প্রচার ও সূতিকাগৃহ-সংস্কার আন্দোলন প্রাচীনপন্থীদের মনঃপুত না হওয়াতে তাঁহারা শশিপদ বাবুর বিরুদ্ধাচরণ করিতে ও নানাভাবে তাঁহাকে নির্য্যাতিত করিতে থাকেন। শশিপদবাবু অন্তঃপুরস্থ মহিলাদের বিদ্যার্জ্জনের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য ফিমেল সার্কুলেটিং লইব্রেরী নামক একটি পুস্তকালয় স্থাপন

করিয়া গৃহে বসিয়া নারীগণ যাহাতে জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ১৯শে মার্চ্চ তারিখে, শশিপদবাবু বরাহনগরবাসীদিগের পরিবারস্থ মহিলাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার মানসে দীননাথ নন্দীর দালানে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সর্ব্বসাধারণের জন্য স্ত্রী শিক্ষার দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। তিনি এই স্কুলের সহিত বালিকাদের বাসের জন্য একটি বোর্ডিংও স্থাপন করেন। কিছুদিন পরে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, এই বোর্ডিং বরাহনগর বিধবাশ্রমে পরিণত হয় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে, শশিপদবাবু তাঁহার বিধবা ভাগিনেয়ী (জেঠতুত ভগ্নীর কন্যা) কুসুম-কুমারীর বিবাহ দেন। কুসুমকুমারী শশিপদবাবুর আশ্রিতা ছিলেন। এই বিবাহের পাত্র মনোনীত হইলেন, বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত ও অল্প বয়সে বিপত্নীক চন্দ্রনাথ চৌধুরী। তাহার পর শশিপদবাবুর চেষ্টায় একে একে প্রায় চল্লিশটি বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে এবং তিনি নিজেও বিপত্নীক হইয়া এক বিধবা গিরিজাকুমারী সেনকে দ্বিতীয়বার দারগ্রহণ করেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পুণা সহরে, স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের সহায়তায় ফার্গুসন কলেজের অধ্যাপক কার্ভে যে বিধবাশ্রম স্থাপন করেন তাহার মূলে আছে শশিপদবাবুর সহিত কার্ভে ও ভাণ্ডারকের আলোচনা এবং এই বিধবাশ্রম স্থাপনের জন্য প্রাথমিক সাহায্য হিসাবে শশিপদ বাবু পাঁচ শত টাকা দান করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে শশিপদ বাবুর উৎসাহে তাঁহার দুই কন্যা বনলতা ও উষালতার পরিচালনায় "অন্তঃপুর" নামে নারীদিগের দ্বারা লিখিত ও সম্পাদিত এক মাসিক পত্রিকা পরিচালিত হয়। এইরূপে শশিপদবাবু নারীকল্যাণ যজ্ঞে আপনাকে নিয়োজিত রাখিয়া বাংলার নারী আন্দোলনের একজন বন্দনীয় নেতারূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

মহেশচন্দ্র আতর্থী ছিলেন একজন নীরব কর্ম্মী। যৌবনেই তিনি নারী-আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন ও দ্বারকানাথের শিষ্য হিসাবে কল্যাণ যজ্ঞে যুক্ত হন। অসম সাহসী নির্ভীকচেতা এই কর্ম্মীটি বিপন্না নারীকে উদ্ধার করিতে গমন করিয়া একাধিকবার মৃত্যুর সহিত রণ করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন।

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে তৎকালে বহু দরিদ্র রমণী আশ্রয়লাভ করিয়া শিক্ষালাভ করিত। এইরূপ একটি বালিকা গিরিজাকুমারী যখন মিস নীলের স্কুলে অধ্যয়ন করিত, তখন অম্বিকা নামক একটি উচ্ছৃঙ্খল যুবক তাহার প্রতি আসক্ত হয়, কিন্তু বালিকাটি তাহার প্রেম নিবেদন গ্রহণ না করাতে যুবকটি উন্মত্তপ্রায় হইয়া গিরিজাকে হত্যা করিবার ভয় প্রদর্শন করে। একদিন সত্য সত্যই বালিকাটি যখন স্কুলের গাড়ী হইতে নামিয়াছে সেই সময় সেই যুবকটি ছুরিকা দ্বারা বালিকার প্রাণনাশের চেষ্টা প্রায়। বালিকার আর্ত্তনাদে নিকটস্থ কেহ বড় কর্ণপাত করিল না, কিন্তু মহেশচন্দ্র দূর হইতে আর্ত্তনাদ শুনিয়া দৌড়িয়া আসিয়া যুবককে বাধা দিলেন। কিন্তু দেরী হইয়া' পড়াতে বালিকাটিকে রক্ষা করা সম্ভব হইল না ও নিজেও মস্তকে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া হাঁসপাতালে বহুদিন জীবন মৃত্যুর দোলায় কাটাইয়া ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠেন।

এই বিপদের পরও মহেশচন্দ্র ভীত হইয়া পড়েন নাই। বহুবার বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যদিয়া বহু নারীকে উদ্ধার করিয়াছেন। একবার কলিকাতায় এক প্রসিদ্ধ ধনীর গৃহে অবরুদ্ধ এক অপহৃতা নারীকে উদ্ধার করিয়া আনিতে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। কিন্তু মহেশচন্দ্রের নৈতিক বলে অসাধ্য সাধনও সম্ভব হইয়াছিল। নারীটি তাহার শিশু কন্যাসহ মহেশচন্দ্রের চেষ্টায় উদ্ধার লাভ করে। উত্তরকালে শিশুকন্যাটির

সহিত একটি সৎব্রাহ্মের বিবাহ হয় এবং আজিও এই পরিবারটি সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

"নারীরক্ষাসমিতি" স্থাপন করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসাবে মহেশচন্দ্র কত নিগৃহীতা ও অপহৃতা নারীর উদ্ধার সাধন করিয়াছেন ও দুর্বৃত্তদিগকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত করিয়া শাস্তি দিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় এই সমস্ত নারী নির্য্যাতন প্রতিকার কাহিনী ও মামলা মোকর্দ্দমার বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হওয়াতে মহেশচন্দ্রের যশ যেমন চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তাঁহার কার্য্যের পরিধিও ততই বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। নির্য্যাতিত নারীর এরূপ অকৃত্রিম সুহৃদ বিরল।

দুইটি স্মরণীয় মামলা

এতদিন পর্য্যন্ত সামাজিক অত্যাচার হইতে নারীজাতিকে মুক্তি দিবার যে সমস্ত প্রয়াস দেখা গিয়াছিল তাহার মূলে নারীমঙ্গলকামী পুরুষদিগের প্রচেষ্টাই বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশের শ্রীমতী রুক্মাবাই নাম্নী একটি দৃঢ়মতী নারী অশেষ দুঃখ বরণ করিয়া অত্যাচারী স্বামীর অন্যায় অধিকার হইতে নারীর মুক্তির উপায় করিয়া দিয়া নারীর অধিকাব প্রতিষ্ঠায় নারীর প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করেন। দাদাজি নামে একজন অত্যাচারী দুশ্চরিত্র ব্যক্তির সহিত রুক্মাবাইএর বিবাহ হইয়াছিল। রুক্মাবাই এই দুশ্চরিত্র অযোগ্য স্বামীর সহিত বাস করিতে অস্বীকার করিলে দাদাজি দাম্পত্য অধিকার পুনঃ স্থাপন বিধির সাহায্যে আপন পত্নীকে স্বামীর সহিত বাস করিতে ও দাম্পত্য অধিকার প্রদান করিতে বাধ্য করিবার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হন। মিষ্টার জাষ্টিস পিনহের নিকট বিচারে বিচারপতি রুক্মাবাইএর পক্ষে

রায় প্রদান করেন। দাদাজি বিচার আইনমাফিক হয় নাই বলিয়া পুনর্ব্বিচারের দাবীতে আপীল করিলে বোম্বাই হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চ মামলা পুনর্ব্বিচারের জন্য প্রেরণ করিলে বিচারপতি ফ্যারান দাদাজির পক্ষে রায় দিয়া রুক্মাবাইকে দাদাজির দাম্পত্য অধিকার স্বীকার করিতে আদেশ প্রদান করেন। রুক্মাবাই আদালতের রায় মানিতে অস্বীকার করাতে আদালত অবমাননার জন্য তাঁহার প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ্চ এই সম্পর্কে রুক্মাবাই পণ্ডিতা রমাবাইকে এক তেজগর্ভ পত্র লেখেন। সেই পত্রে তিনি লেখেন যে—

"I shall be cast into the state prison before this letter reaches you; because I do not and cannot obey the order of Mr. Justice Farran."

রুক্মাবাই সানন্দে কারাবরণ করিলেন, তবুও আদালতের এই অন্যায় সহ্য করিলেন না। নারীমঙ্গলকামী দল এই ব্যাপার লইয়া তুমুল আন্দোলন তুলিলেন। প্রার্থনা সমাজের সুবোধ পত্রিকা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার, ব্রাহ্মদল পরিচালিত সঞ্জীবনী প্রভৃতি পত্রিকায় রুক্মাবাইকে সমর্থন করিয়া প্রবলবেগে আন্দোলন চলাতে জনমত জাগ্রত হইল। ইহার পর স্থির হয় যে আদালত দাম্পত্য অধিকার বিধি অনুসারে ডিক্রী দিলেও সেই ডিক্রী অবহেলা করিলে কোনও নারীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বামীর ঘর করিতে কিম্বা ঐ আদেশ অমান্য করার জন্য শাস্তি দিতে আদালত হস্তক্ষেপ করিবেন না। রুক্মাবাই নির্য্যাতন সহ্য করিয়া বহু নির্য্যাতিতা নারীর মুক্তির উপায় করিয়া দিয়া ধন্য হইয়াছেন ও নারীর মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূতরূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

অপর মামলাটির ফলেই সহবাস সম্মতি আইন বিধিবদ্ধ হয়।

ফুলমনি নামে একটি নবম বর্ষীয়া বালিকাবধূ পশুপ্রকৃতি স্বামীর পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে বাধ্য হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই মৃত্যুর তদন্তে যে সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হয় তাহার ফলেই ভারত সরকার সহবাস সম্মতি আইনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। এ দেশের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের ঘোর আপত্তি উপেক্ষা করিয়া আইনটি বিধিবদ্ধ করেন। এই আইন পাশ করাইবার পক্ষে যাহারা ব্রতী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বোম্বাই প্রদেশের সুবিখ্যাত সমাজ-সেবক বৈরামজি মালাবারী প্রধান। এই আইন উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আইন সভায় গৃহীত হয়।

একজন নারীর স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ ও অপর একজন বালিকার অপমৃত্যু এইরূপে নারীজাতির চিরন্তন মঙ্গলের আকর হইল, সেজন্য এই দুইটি মামলা নারীমঙ্গল যজ্ঞের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বয়ং প্রতিষ্ঠ নারী আন্দোলন

প্রগতিশীল নারী আন্দোলন পরিচালনে যাঁহারা ব্রত ছিলেন, তাঁহারা নিজ পরিবারের কন্যাদিগকে শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় অভ্যস্ত করাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহাদিগকে এমনভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে তাঁহারা প্রায় সকলেই উত্তরকালে নব নব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া সংগঠন শক্তিতেও যে নারীগণ কম নহেন, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা স্বর্ণকুমারী ও পুত্রবধূ জ্ঞানদানন্দিনী, রামতনু লাহিড়ীর ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধারাণী ও অন্নদাদায়িনী, ব্রজকিশোর বসুর কন্যা কাদম্বিনী, দুর্গামোহন দাসের কন্যা সরলা ও অবলা, কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি ও সুচারু, স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা হিরণ্ময়ী ও সরলা, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সরোজিনী, মৃণালিনী ও সুলাজিনী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী ও জয়ন্তী, কৃষ্ণ কুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী ও বাসন্তী, ভুবনমোহন দাসের কন্যা উর্ম্মিলা, বরদানাথ হালদারের কন্যা বাসন্তী, অন্নদাচরণ খাস্তগিরের কন্যা কুমুদিনী, চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা কামিনী, নবীনচন্দ্র রায়ের কন্যা হেমন্তকুমারী প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের নারীরত্নগণ ও খৃষ্টান সমাজের ভুবনমোহন বসুর কন্যা চন্দ্রমুখী, বিধুমুখী, বিন্ধ্যবাসিনী ও রাজকুমারী আপনাদের কর্ম্মক্ষমতা দ্বারা প্রমাণ দিয়াছেন যে উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগ লাভ করিলে নারীগণও সুবৃহৎ জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে এবং সমাজ, রাষ্ট্র ও সাহিত্যের সেবায় পুরুষদিগের সহিত সমান তালে চলিতে পারেন।

স্বর্ণকুমারী

স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্য সাধনা যে অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাকে জগত্তারিণী পদক প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরচ্চন্দ্রের পরই এই সম্মান লাভের যোগ্য যে তিনিই, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া বিশ্ববিদ্যালয় একজন প্রকৃত গুণীকেই সম্মানিত করিয়াছেন।

স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য সাধনার ক্রমবিকাশের ধারা জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁহার জীবনস্মৃতিতে অতি অল্প কথায় বেশ পরিষ্কারভাবে বিবৃত করিয়াছেন। জ্যোতিবাবু বলিয়াছেন যে তাঁহাদের অন্তঃপুরে অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় মেয়েদিগকে সংস্কৃত পড়াইতেন। "এই সময়ে আমার সেজ দাদা (হেমেন্দ্রনাথ) মেয়েদিগকে 'মেঘনাদবধ' প্রভৃতি কাব্য পড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। তারপর মেজদাদা (সত্যেন্দ্রনাথ) বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল যে, মেয়েদের জ্ঞানস্পৃহা দিন দিন বাড়িতেছিল এবং তাঁহাদের হৃদয় মনের ঔদার্য্যও অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছিল। আমি সন্ধ্যাকালে সকলকে একত্র করিয়া ইংরেজী হইতে ভাল ভাল গল্প তর্জ্জমা করিয়া শুনাইতাম—তাঁহারা বেশ উপভোগ করিতেন। এর অল্পদিন পরেই দেখা গেল যে আমার একটি কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন।"

তাহার পর "দীপনির্ব্বাণ" নামে বহুজন-প্রশংসিত উপন্যাস ও "পৃথিবী" নামক বৈজ্ঞানিক পুস্তক রচনা করিয়া স্বর্ণকুমারী সাহিত্য জগতে পরিচিত হইয়া উঠেন। "ভারতী" পত্রিকা অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়া প্রবন্ধ নির্ব্বাচন ক্ষমতা ও রসবোধে তিনি যে পুরুষ সম্পাদক অপেক্ষা কোনও অংশে কম নহেন, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ছিন্নমুকুল, বসন্ত উৎসব, গাথা, নবকাহিনী, মিবাররাজ, বিদ্রোহ, স্নেহলতা, ফুলের মালা, কাহাকে, ইমামবাড়া, দেবকৌতুক, কনে বদল, পাকচক্র প্রভৃতি বহুগ্রন্থ রচনা করিয়া সাহিত্য সমাজে তিনি তাঁহার স্থান অক্ষয় করিয়াছেন।

জ্ঞানদা-নন্দিনী

জ্ঞানদা-নন্দিনী দেবী ঠাকুর পরিবারের সাহিত্যসাধকদিগকে উৎসাহ-দান করাতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে তরুণ বয়সে সাহিত্য-সেবায় রত থাকিতে উৎসাহিত হইয়াছিলেন তাহা রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।

"বালক" পত্রিকা ও "ভারতী ও বালক" জ্ঞানদা-নন্দিনীর উৎসাহে ও সাহায্যে যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করে। বাঙ্গলা সাময়িক পত্রিকাকে চিত্রশোভিত করিবার জন্য ঠাকুরবাড়ীর ছেলেরা যখন নিজেদের আঁকা ছবি লিথো করিয়া ছাপিতে মনস্থ করেন, তখন জ্ঞানদা-নন্দিনীর অর্থানুকূল্য লাভ করাতেই তাঁহাদের লিথো প্রেস স্থাপন সম্ভবপর হইয়াছিল।

বোম্বাই অবস্থানকালে সে অঞ্চলের নারীদের স্বচ্ছন্দ গতিতে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে দেখিয়া অবরোধপ্রথা-দুষ্ট এই বাংলাদেশে নারীদের স্বচ্ছন্দ বিহারের সেই ধারা প্রচলন কল্পে ইহাঁর প্রযত্ন যে আজকাল নারীর সর্ব্বত্র বিহার সম্ভব করাতে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্গনারীর পোষাক পরিচ্ছদের বর্ত্তমান শালীনতার মূলেও আছে তাঁহার প্রযত্ন। বোম্বাই অঞ্চলে পার্শী মহিলাদের পরিচ্ছদের শালীনতায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে আদর্শ করিয়া এদেশের সৌন্দর্য্যবোধ এবং সামাজিক পরিবেষ্টনের সহিত খাপ খাওয়াইয়া তিনি যে কাপড় পরার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, তাহাই যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ

পরিবর্ত্তিত হইয়া বঙ্গ নারীর আজিকার যুগের সুন্দর ভব্যতাপূর্ণ পরিচ্ছদে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

সরলা ও অবলা

দুর্গামোহন দাস তাঁহার কন্যা সরলা ও অবলাকে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য প্রেরণ করেন। এখানে তাঁহারা উভয়েই দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার নিকট কর্ম্মজীবনের প্রেরণা লাভ করেন এবং তাহার ফলে সুশিক্ষিতা হইয়াই ইঁহারা ক্ষান্ত থাকেন নাই। নারী-কল্যাণকর নানা প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালন করিয়া ইঁহারা যে অদ্ভুত সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সমাজে বিরল। সরলা রায়ের চেষ্টাতেই ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় প্রথম শ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়; তাহার পর তিনি গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল নামক আর একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পরিচালকরূপে আজিও যথেষ্ট সংগঠনী শক্তির পরিচয় দিতেছেন। সরলা রায় ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদিকার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার ভগিনী অবলা বসু মহাশয়ার উপর উক্ত বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালন ভার অর্পিত হয়। তাঁহার সময়ে তাঁহার চেষ্টাতেই ওই স্কুলের দুর্গামোহন ভবন ও আনন্দমোহন ভবন নামে দুইটি বৃহৎ বাটী স্কুলের প্রাঙ্গণে নির্ম্মিত হয় এবং স্কুলটির নানাপ্রকার বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। বাঙ্গালার গ্রামাঞ্চলে নারীজাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে "নারীশিক্ষা সমিতি" নামক একটি সমিতি গঠন করিয়া তাহার সাহায্যে বহুতর গ্রাম্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ইনি স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে বহুপ্রকার সাহায্য করিয়াছেন। বাংলার বিধবাদিগকে শিল্প শিক্ষা দিয়া ও স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হইবার উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা দিয়া তাহাদের স্বাবলম্বী করিয়া

তুলিবার জন্য "বিদ্যাসাগর বাণী ভবন" নামক বিধবাদিগের বোর্ডিং স্কুল স্থাপনও ইঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। কলিকাতায় সারকুলার রোডে প্রধানতঃ শ্রীমতী হরিমতী দত্তের অর্থানুকূল্যে একটি নিজস্ব সুবৃহৎ বাটীতে ও ঝাড়গ্রামে নিজস্ব বহু জমিজমা সমেত কুটিরগুলিতে এই বাণীভবন বেশ স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বহু বিধবার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। কর্ম্মদক্ষতা, সংগঠনী শক্তি ও পরিচালন ব্যবস্থায় সরলা ও অবলা যে অপূর্ব্ব ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন পুরুষের মধ্যেও তাহা বিরল।

হিরণ্ময়ী ও সরলা

স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলা সাহিত্যের সেবাতে যে কেবল যশস্বী হইয়াছেন, তাহা নহে, তাঁহার দুই কন্যা হিরণ্ময়ী ও সরলাকে এমনভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে তাঁহারা পরবর্ত্তীকালে কর্ম্মজগতে আপনাদের স্থায়ী আসন করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন। হিরণ্ময়ী দেবী নারীদের জন্য শিল্প-নিকেতন প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে স্থায়িত্ব দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তিরোভাবের পরও সেই প্রতিষ্ঠান "হিরণ্ময়ী শিল্প প্রতিষ্ঠান" রূপে আজিও বর্ত্তমান থাকিয়া নারীকল্যাণ ব্রতসাধন করিতেছে।

সরলাদেবী মাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া "ভারতী" পত্রিকা অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত বহুদিন পরিচালন করিয়াছিলেন। সে সময়ে "ভারতী" স্বাদেশিকতার মন্ত্র প্রচারের শ্রেষ্ঠ মুখপত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। দেশের যুবশক্তির দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করিয়া তাহাদের বলবীর্য্যকে দেশের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত করিবার জন্য তিনি ব্যায়াম সমিতি স্থাপন ও বীরাষ্টমী মেলার ব্যবস্থা করিয়া স্বদেশী যুগে যুবজনের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। কংগ্রেসে সঙ্গীত পরিচালনা ও কংগ্রেসের জন্য নূতন জাতীয়

সঙ্গীত রচনা করা, "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার" নামে স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয়ের কেন্দ্র স্থাপন করা প্রভৃতি বহুবিধ সংগঠনমূলক কার্য্যের মধ্য দিয়া তিনি স্বাদেশিকতার প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার নেতৃত্ব একদিন এদেশের যুবজন সমাজে খুব আদর ছিল।

অন্যান্য নারীকর্ম্মীর দল

অন্নদাচরণ খাস্তগিরের কন্যা কুমুদিনী বহুদিন বেথুন কলেজের লেডি প্রিন্সিপ্যালের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যোগ্যতার সহিত শিক্ষা আয়তন পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা কামিনী রায় বিখ্যাত নারী-কবি রূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি ও সুচারু কথকতা, উপাসনা প্রভৃতি সাহায্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম যোগ্যতার সহিত প্রচার করিয়া পিতার উপযুক্ত কন্যা-রূপেই আপনাদের প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বরদানাথ হালদারের কন্যা বাসন্তীদেবী অসহযোগ আন্দোলন সময় বাংলাদেশে সর্ব্বপ্রথম নারীবাহিনীর নেতৃত্ব করিয়া ধৃত হন। রাজরোষের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযানে বাহির হওয়া ব্যাপারে বাংলার নারী সমাজে তিনি প্রথম পথ-প্রদর্শিকা। ভুবন মোহন দাসের কন্যা উর্ম্মিলা দেবী অসহযোগ আন্দোলনের সময় "নারীকর্ম্ম মন্দির" স্থাপন করিয়া এদেশের নারীদিগকে সত্যাগ্রহে শিক্ষিতা করিয়া তুলিতে সাহায্য করেন। নবীনচন্দ্র রায়ের কন্যা হেমন্ত কুমারী যুক্ত-প্রদেশে ও পাঞ্জাবে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে নানারূপ সাহায্য করিয়া উত্তর ভারতে নারীসেবাব্রতীদিগের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা হেমলতা শিক্ষা ও সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার "নেপালে বঙ্গনারী" "শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনী" ব্রজসুন্দর মিত্রের জীবনী প্রভৃতি সুলিখিত পুস্তক ও নানা সাময়িক পত্রে

প্রকাশিত বহুবিধ রচনা তাঁহার সাহিত্য প্রতিভার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। যৌবনে ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বোর্ডিংএ তাঁহার কর্ম্মজীবনের আরম্ভ হয়। সেখানে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, তাহা বৃথা যায় নাই। উত্তর-কালে দার্জ্জিলিঙ্গে "মহারাণী গার্লস স্কুল" নামক উচ্চ শ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয় সংগঠন করিয়া তিনি প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে পিতার সংস্পর্শে তিনি যে যৌবনেই নারী কল্যাণ ব্রতে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাহার আজীবন ব্রত হইয়া তাঁহাকে কর্ম্মপ্রেরণা দিয়াছে। দার্জ্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যা মনোনীত করিয়া বাঙ্গলা সরকার তাঁহার কর্ম্ম দক্ষতার পুরস্কার দিয়া নারীও যে পৌরজন সেবার ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষতা করিতে পারে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। হেমলতা দেবী বাঙ্গলা দেশে সর্ব্বপ্রথম মহিলা মিউনিসিপ্যাল কমিশনার।

কলিকাতা কর্পোরেশনে নারীগণও যখন পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়া কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হইবার অধিকার লাভ করিলেন তখন কৃষ্ণকুমার মিত্রের দুহিতা কুমদিনী বসু ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দুহিতা জ্যোতির্ম্ময়ী নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়া পুরুষদিগের সহিত দ্বন্দ্বে জয়লাভ করিয়া কর্পোরেশনের প্রথম নির্ব্বাচিত মহিলা কাউন্সিলার হন।

কুমদিনী ইতিপূর্ব্বেই সাহিত্যক্ষেত্রে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং 'সুপ্রভাত' নামে একটি মাসিক পত্রের সম্পাদকতা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী কলিকাতা, কটক, কলম্বো, জলন্ধর প্রভৃতি স্থানে মহিলাদের উচ্চশিক্ষাদানের শিক্ষা আয়তনের অধ্যক্ষরূপে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া পরে বিদ্যাসাগর বাণীভবন সংগঠনে বিশেষ সাহায্য করেন এবং বাঙ্গালা দেশে কংগ্রেসী আন্দোলনে নারীদিগের নেতৃস্থানীয়া হইয়া কয়েকবার কারাবরণ করিয়াছেন।

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর কবিপ্রতিভা

অল্পবয়সেই বিকশিত হইয়া উঠে এবং ইংরেজি সাহিত্যে তিনি একজন উচ্চদরের লেখক হিসাবে যৌবনেই সমাদৃত হন। সুবক্তা হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি অলোকসামান্য। গান্ধী আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর হইতেই রাষ্ট্রনায়ক রূপেও তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে এবং ভারতের জাতীয় মহাসভা উক্ত সভার বার্ষিক সম্মেলনে একবার তাঁহাকে সভানেত্রী নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহার রাষ্ট্র প্রতিভাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ভারতের নারী সমাজও যে সুযোগ ও সুবিধা পাইলে রাষ্ট্র জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে, সরোজিনী তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বহু বৎসর হইতেই জাতীয় মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যা।

উনবিংশ শতকের শেষার্দ্ধে নারীর মুক্তি আন্দোলন এরূপভাবে নারীদিগের দ্বারাই প্রসার লাভ করিতে থাকে। তাহার ফলে আজ ভারতের নারী আন্দোলন অভাবনীয় সাফল্যলাভ করিয়াছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী ও কামিনী রায় সাহিত্য ক্ষেত্রে যশ মুকুট লাভ করার পর বহুনারী সাহিত্যব্রতী বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

লোকহিতমণ্ডলী গঠনে নারী প্রতিভার স্ফুরণ বোম্বাই প্রদেশের বনিতা সমাজ, বাঙ্গালার ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল, নারী শিক্ষা সমিতি, বিদ্যাসাগর বাণী ভবন, নারী কর্ম্ম মন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল গঠনে বহুবাজারের শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের বাড়ীর বধু ও দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের পত্নী কৃষ্ণভাবিনী দেবী অসামান্য কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

রাষ্ট্র জগতে আজ রাধাবাই সুব্বারাঁয়া, বেগম সাহ নেওয়াজ, মথুলক্ষ্মী রেডি, জেঠি সিপাই মালিনী, রুক্মিনী লক্ষ্মীপতি, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত অরুণা আসফ আলি, পূর্ণিমা ব্যানার্জ্জি, আম্মু স্বামী নাথম প্রভৃতি নারীরত্নের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। বিজ্ঞান জগতেও যে সুযোগ ও

সুবিধা পাইলে মৌলিক প্রতিভার বিকাশে ভারত-নারী পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে তাহার প্রমাণ দিয়াছেন উদ্ভিদ বিদ্যায় মৌলিক গবেষণা করিয়া ডাক্তার জানকী আম্মল, পদার্থ বিদ্যায় মৌলিক গবেষণা করিয়া শ্রীমতী বিভা মজুমদার ও রসায়ন শাস্ত্রে ডাক্তার শীলা ধর ও অনিমা মুখোপাধ্যায়।

যুদ্ধ বিদ্যার আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র পরিচালনে অসামান্য দক্ষতা দেখাইয়া ও রণক্ষেত্রে অপূর্ব্ব শৌর্য্যের পরিচয় দিয়া "ঝাঁসীরাণী ব্রিগ্রেডে"র ভারতীয় নারীবাহিনী ভারতনারীর স্বাধীনতা স্পৃহাকে যে নূতনরূপ দিয়াছে তাহা বহুদিন পর্য্যন্ত নারীদিগকে অনুপ্রাণিত করিবে এবং এজন্য ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথনের নাম ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তি সাধনার অগ্রদূতগণ যে নারীর মুক্তি আন্দোলন উনবিংশ শতকে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার জন্যই বর্ত্তমানকালে নারীর এই সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ এত শীঘ্র সম্ভবপর হইয়াছে। সেজন্য নারী-সমাজ ব্রাহ্মসমাজের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।